1984

ঘাসিডগি কলেজ

পত্রিকা

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক
সুকান্ত চৌধুরী

সম্পাদনা
সুদীপ্ত সেনগুপ্ত
বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোষ

প্রকাশনা-সম্পাদক
সুব্রত সেন

এপ্রিল ১৯৮৪
চৈত্র ১৩৯০

প্রচ্ছদ : সমীর রায়

নামপত্র : সত্যজিৎ রায়

অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত এবং রেপ্রিণ্ট, কলকাতা ৭০০০২৫ থেকে মুদ্রিত।

F O R E W O R D

It is with pleasure that, at the invitation of the College Magazine editors, I take up my pen to greet my honourable colleagues and beloved pupils, and to salute the magazine of this historic institution which was once considered to be a citadel of Indian education.

It is really in the fitness of things that Presidency College should publish a magazine every year, and I believe this to be the opinion of a large majority of the present members of the College. Rightly viewed, a college magazine is an organ of the corporate life of the college, and its regular publication is greatly to be desired. Not only does it record all academic events, but it also stimulates college activities. These functions can be served only by regular publication. This in turn depends not only on the energy and organisational skills of the Magazine Committee but also on adequate financial assistance from the Government of our state.

It is really unfortunate that the magazine could not be published for one year not because of our students' lack of energy but simply owing to paucity of funds. The cost of paper and printing has risen steeply, and adequate funds are not forthcoming. We cannot raise the magazine fee paid by the students in the form of session charges ; nor have we been able to impress upon the government the need for liberal funds. This must form the substance of any apology for irregular publication. The present issue has been made possible owing to the hard work of our students and professors, and serves as an index of the academic life of the College.

May Presidency College flourish more and more, and long may the Presidency College Magazine prosper.

A. K. Mukherji

PRINCIPAL

সূচীপত্র

সুদীপ্ত সেনগুপ্ত	সম্পাদকীয়	১
ফজলুল হক	মাছধরা	৩
তপোব্রত ঘোষ	রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্পের ভূমিকা	৯
গার্গী দত্ত	বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় : এক নির্জন ব্যক্তিত্ব	১৪
বিদিশা ঘোষ দস্তিদার	ফসল	১৮
	কবিতা	২০
শঙ্খ ঘোষ	হাসপাতাল	
শক্তি চট্টোপাধ্যায়	ছুটি	
সুতপা সেনগুপ্ত	যাপনগুচ্ছ	
সুদীপ্ত সেনগুপ্ত	খিন্নভিন্ন	
সুব্রত সেন	এই সব ব্যর্থ কথা	
প্রগতি চট্টোপাধ্যায়	প্রবাস	
অভিজিৎ লাহিড়ী	মনে করো বহুদিন পরে আজ	
ভাস্বতী চক্রবর্তী	স্মৃতিরা	
অভিজিৎ দত্ত	জীবনকে খুঁজেছিল তাই	
দেবব্রত লাহিড়ী	কোথায়, লাবণ্য, কোথায় ?	
সোমক রায়চৌধুরী	সেই শিল্পী ও এক কবির হ'য়ে-ওঠা	২৭
রঞ্জন লাহিড়ী	নম্-ডি-প্লুম্	৩৪
অয়নেন্দ্রনাথ বসু	জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ণ : একটি দৃষ্টিকোণ	৩৫
পারঙ্গমা রায়চৌধুরী	আর্কিমিডিসের চাবি	৩৯
প্রবোধ বিশ্বাস	ইডেন হিন্দু হোস্টেলের ইতিকথা : প্রথম পর্ব	৪২
শ্রবসী ঘোষ	বাংলার রেনেসাঁস—বাস্তব বা অতিকথা	৪৬
সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়	ফিরে আসা	৫২
শিবব্রত রায়/ভানুসিংহ ঘোষ	প্রসঙ্গ : কলেজ অটোনমি : একটি বিতর্ক	৫৪
সুব্রত সেন	আরো কিছু কাজের কথা	৫৭

Nirmalya Ghoshal	Philip Larkin : A Preface	1
Ambar Niel Sen Gupta	A Critique of Physics	5
Sudeshna Chakravarty	Marxism and Literature	7
Arusharka Sen	The Master Form	9
Brinda Bose	Cactus-Flowers	12
Malini Guha	Interregnum	13
Sudipto Sen	A Poem	13
Sreerup Ray Chaudhury	Sukumar Ray for beginners	14
Rudrangshu Mukherjee	The Antinomies of Richard Wagner	19
Bhaskar Sarkar	The Chasm	24
Srimati Basu	The Survival of the Unfit : Neo-Darwinism Through Literature	27
Bishnupriya Ghosh	Editorial	28

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সম্পাদকীয়

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার এই সংখ্যা দু'বছর পর প্রকাশিত হচ্ছে। যে পত্রিকা দু'বছর পর প্রকাশিত হয় তার কোন নির্দিষ্ট ধারাবাহিক চরিত্র থাকতে পারে না। কলেজে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীর স্থিতিকাল মাত্র তিন বছর। এই অপ্রকাশনার অবসরে হয়তো কলেজে একটি নির্দিষ্ট চিন্তা-ধারার জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই ঘটে গেছে। এ পত্রিকায় তার প্রতিফলনের কোন সুযোগই আর নেই।

প্রথমদিকে তাই এ পত্রিকার সম্পাদনার ভার হাতে পেয়ে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। কি এই পত্রিকায় থাকা উচিত, কি উচিত নয়, প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত বিষয়বস্তুর কোন কলেজ পত্রিকা-সুলভ সীমা থাকা উচিত কিনা, বিশুদ্ধ সৃজনধর্মী লেখাকে কতটা জায়গা ছাড়া যুক্তিযুক্ত এসব প্রশ্ন আমাদের গোড়া থেকেই ভাবিয়েছে। এমনকী ঠিক কোন সুরে সম্পাদকীয় লেখা উচিত, সেটাও। আমরা সসম্ভ্রমে ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুলিনি যে কালগ্রস্ত হবার দুর্নিবার প্রবণতা থেকে ঐতিহ্যকে রক্ষা করার প্রধান উপায় নতুন নিদর্শন সৃষ্টি করা। আমাদের প্রয়োজন একটি বহতা জীবনস্রোত, কিছু মৃত আচারের সমাহার নয়। সহায় ছিল স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি এবং উপস্থিত বিচার বিবেচনা।

* * *

সাধারণভাবে এই মুহূর্তে এ কলেজে শিক্ষাব্যবস্থার কোন বড় রকমের সঙ্কট নেই। অতীতে বারবার যেভাবে শিক্ষার পবিত্রতা ভূলুন্ঠিত হয়েছে—কখনো প্রত্যক্ষ বর্বর আক্রমণে, কখনো বা বুদ্ধিহীনের কুযুক্তি সজ্জিত ইজ্‌মের ভীষণতর আঘাতে, এখন সেভাবে কোন আশু বিপদের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তার মানেই এই নয় যে সামাজিক ইত্যাদি ব্যাপারগুলোতে আমরা দায়মুক্ত হলাম।

পৃথিবীর জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশের কাছে আজ নাগরিক অধিকার কথাটা অজানা। সীমানাটা আরেকটু গুটিয়ে আনলে, নজরটা অন্যদিকে পড়তে দেখি ভারতবর্ষে একশ জন মানুষের সত্তর জন শিক্ষার কোন সুযোগই পায় না। একেবারে ঘরের কথা বললে, এ বঙ্গের আর কোনো কলেজে হিন্দু কলেজের মত লেখাপড়া হয়? অথচ আমাদের মধ্যে কজন এই নির্বাচিত অধিকার ভোগের দায় সচেতনভাবে স্বীকার করি? যারা করেন তাদেরই বা কতজনের ক্ষেত্রে সে সচেতন বোধ সামাজিক ক্রিয়াকর্মের উপর এতটুকু ছাপ ফেলে?

অন্যভাবে দেখি এটা আলাদা হবার যুগ, বিচ্ছিন্ন হবার সময়। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ভেঙে যাচ্ছে এক এক করে। পরিবার ভেঙে আত্মসর্বস্ব নৈরাশ্যবাদী মানুষের জন্ম হচ্ছে। সমাজের বাঁধুনি শিথিল হচ্ছে প্রতিপলে। '...ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার কী?' মন্ত্রের উচ্চারণে। রাষ্ট্র ভেঙে যেতে চায়—মানুষের জীবন দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে দাম মেটানো হয় রাষ্ট্রের বন্ধনের। সমাজ বড় জটিল। পরিবেশ বড় নির্মম। আমাদের অনেক কষ্ট। তবে বুদ্ধি আর শিক্ষা যার আছে, এমনকী বিবেকেরও বালাই তার সবচেয়ে বড় কষ্ট বোধহয় নিজস্ব মূল্যবোধকে সম্মানিত না হতে দেখা—বিশেষত: যেখানে সে সম্মান প্রত্যাশিত ছিল।

এই অসম্মান, এই প্রত্যাখ্যানই কি আমাদের করে তুলেছে এত অসহিষ্ণু? এহেন অস্বস্তিকর সংশয়বাদী? আমরা যার যার নিজস্ব পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে তাই কি নিজেদের চারদিকে ওই

অবজ্ঞা আর নির্লিপ্তির খোলস তৈরী করছি যাতে নিয়তই আহত হচ্ছে অন্যতর মানুষের নতুনতর বিশ্বাস? যেখানে ধ্বনির উত্তরে প্রতিধ্বনি আর ওঠে না। মহামূল্যবান ধ্বনি—মানুষের লক্ষ বছরের সভ্যতার চিন্ময় ফসল প্রতিটি ধ্বনি—মিলিয়ে যায় কোন তরঙ্গ না তুলে, কোন ছাপ না রেখে।

তবু আমরা যারা বেঁচে আছি, আমরা যারা বেঁচে আছি নিতান্ত ঘটনাচক্রে নয়, মরে যাইনি বলে বেঁচে আছি তা নয়, আমরা যারা বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখার স্পর্ধা রাখি তারা মাঝেমধ্যে অন্য-রকম ভাবি। ইচ্ছে করে প্রিয়জনের জন্য ভাল কিছু করি, সুন্দর কিছু রেখে যাই সকলের জন্য। কিছুই যদি না পারি, তবে শুধু এই ইচ্ছেটা? একটা কথা মনে পড়ছে—সব মরে যায়, স্বপ্ন মরে না।

এই বোধটা যখন উথালপাথাল ঝড় তোলে বুকের মধ্যে, তখনই আমরা উপলব্ধি করি যোগাযোগ ব্যাপারটা কত জরুরি আধুনিক মানুষের জীবনে। বিচ্ছিন্ন হতে হতে আমরা গুহা-মানবের কাছাকাছি পৌঁছে যাব একদিন। ইতিমধ্যেই আমরা বুঝতে শুরু করেছি নিজের ভাব অন্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া কী ভয়ঙ্কর প্রয়োজন। শব্দটির মূল অর্থে, ভাব ছাড়া আর আমার কী আছে অন্য মানুষকে দেওয়ার মত? আর তাই অস্থিরতা সংশয়বাদ দ্বারা পীড়িত আজকের ছাত্রসমাজে আমরা স্মরণ করি—প্রশ্ন যদি বুদ্ধির হাতিয়ার হয়, হয় জ্ঞানের মুখপত্র, তবে জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে অন্তত কিছু আদি অহঙ্কারে বিশ্বাস ফিরে আসুক।

পৃথিবী চলেছে দারুণ ওলটপালটের মধ্য দিয়ে। সমাজের পালাবদল ঘটছে দিবারাত্র। তবু প্রেসিডেন্সি কলেজ ফুরিয়ে গেছে, সমাজকে দেশকে আমাদের দেওয়ার কিছুই নেই, মৃত্যুর জন্য প্রহর গোনাই বারোশ উজ্জ্বল যুবকযুবতীর একমাত্র কাজ—এ আমরা বিশ্বাস করি না। কিছুতেই না। কলেজের চত্বরে, পোর্টিকোতে, ক্যান্টিনে যে উচ্ছলতা অনেকের নাক সিঁটকানোর কারণ হয় সেটা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। বরঞ্চ উনিশ বছর বয়স বিনা প্রতিবাদে অভিজ্ঞতার শাসন মেনে নিয়েছে, আজ হঠাৎ এই সংবাদেই আমাদের পিতৃপুরুষেরা বিচলিত হতেন। তবে একথা ভুলে না যাই যে স্বাধীনতা আলাদা আলাদা করে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিপরিচয়ই শুধু নয়, সমষ্টিগতভাবে আমাদের অভিজ্ঞানও বটে।

ভীষণ শব্দে পৃথিবী চুরমার হচ্ছে। আমরা দূর থেকে ওই রূপবান আন্দোলন দেখেই ক্ষান্ত হব? বরঞ্চ হাত লাগাই গড়ার কাজে।

* * *

সরাসরি পত্রিকার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলি আমি কাউকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি না। আমি মনে করি যাঁরা এ পত্রিকার জন্য আমার সঙ্গে একতালে কাজ করেছেন এবং যাঁদের উদ্দেশ্যে এ পত্রিকা তাঁরা সকলেই এর ঠিক ততখানি অংশীদার, যতখানি হলাম আমি।

ভাল, আরও ভাল এবং মনের মত ভাল লেখা পাওয়া একটা সমস্যা মনে হয়েছে। কিছু যোগ্য লেখা স্থানাভাবে ছাপা গেল না। তবে সবচেয়ে হতাশাজনক সম্ভবতঃ প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের দারুণ নিস্পৃহতা। ম্যাগাজিন ব্যাপারটাকে অনেকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে নিল না—এটাই দুঃখ। নইলে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রতিভার অভাব? মেনে নেওয়া কঠিন।

যেটুকু অনিবার্য ঘাটতি রয়ে গেল, সেটুকু পুষিয়ে নিয়ে পরের সংখ্যাই নিঃসন্দেহে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আপাতত ভালবাসা চাই। এবং বিশ্বাস।

জানুয়ারি ১৯৮৪

সুদীপ্ত সেনগুপ্ত

ফজলুল হক

[ঊনিশশো তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ সালে লিখিত একটি গল্প ঊনিশশো তিরাশি-চুরাশি সালের কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। লেখকের নাম ফজলুল হক (১৯১৬-৪৯)। এই কলেজের দর্শন বিভাগের ছাত্র ছিলেন (১৯৩৩-৩৭)।

হক সায়েব মানুষটি ছিলেন সেই জাতের যাঁরা মূলতঃ নক্ষত্রের দেশের—আমাদের মাঝে যাঁরা অতিথি হয়ে আসেন। ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুবের ঘনিষ্ঠ গুণগ্রাহী বন্ধু। আইয়ুব সায়েবের স্বচ্ছ যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাধারা বঙ্গভূমিতে প্রসিদ্ধ। ফজলুল হক এবং আইয়ুব সায়েব উভয়েরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রদ্ধেয় প্রীতীশ দত্তের মতে ফজলুল হক ছিলেন আইয়ুবের চেয়েও clear thinker। তাঁদের সান্ধ্য আড্ডা বসত ওয়াসিউল্লা লেনে আইয়ুবের বাড়িতে এবং কলেজ স্ট্রীট Y.M.C.A.তে। সেই আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, হুমায়ুন কবীর, শওকত ওসমান প্রমুখ। হক সায়েব সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তাঁর সুহৃদরা একবাক্যে বলেছেন তাঁর অনাড়ম্বর বিদগ্ধ জীবনের কথা, জ্ঞানবুদ্ধিতে উজ্জ্বল স্বচ্ছ চিন্তাধারার কথা, তাঁর স্পর্শকাতর শিল্পীসত্তার কথা। কোথায় যেন সে শিল্পী আমাদের পাঁচজনের থেকে আলাদা, যিনি বলেছিলেন, Even if I might have the genius to be misunderstood, I positively hate to be pitied.

প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন সম্বন্ধে জানা গেছে যে তিনি দর্শন বিভাগের সেমিনার সেক্রেটারী ছিলেন। ক্লাশ করতেন না বিশেষ, পাঠ্য বইয়ের থেকে অন্য ধরণের বই পড়ে বেশি আনন্দ পেতেন। মানুষটি ছিলেন অন্তর্মুখী। তৎকালীন কোন লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। দেশ ভাগের পর কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চাশ টাকার চাকরি ছেড়ে অনিচ্ছার সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে চলে যান। এই মানসিক নির্বাসনই কি তাঁর প্লেটো-অ্যারিস্টটল-মার্ক্স গুঞ্জরিত মাথা ধাবমান ট্রেনের চাকার তলায় পেতে দিতে বাধ্য করেছিল ?

মাত্র পাঁচটি গল্প লিখেছিলেন হক সায়েব তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে। তার মধ্যে দুটি গল্প হারিয়ে গেছে চিরতরে, অন্য তিনটি একত্র করে প্রকাশ করেছেন তাঁর দুই সুহৃদ জনাব শওকত ওসমান এবং শ্রীপ্রীতীশ দত্ত। তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ, কারণ তাঁরা বিস্মৃতপ্রায় এক অসামান্য গল্পকারকে আজকের পাঠকের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

জনাব শওকত ওসমান সম্পাদিত 'ফজলুল হকের গল্প ঃ একটি স্মরণিকা' গ্রন্থ থেকে 'মাছধরা' গল্পটি শ্রীপ্রীতীশ দত্তের স্নেহানুকূল্যে পুনর্মুদ্রিত হল। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল চতুরঙ্গ পত্রিকার ১৩৫১ সালের চৈত্র সংখ্যায়।]

মাছধরা

আলম এগারটা. মনু ছয়টা আর আলতু মোটে তিনটা। শীতের সকালে এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া মাছ ধরায় মজা আছে। ছিপে একটা পুঁটিও যদি ঠোকর না দেয় তবু ইহারা ছিপ ফেলিতে ছাড়িবে না। কিন্তু এইখানেই সব হিসেবের শেষ নয়, কিছুটা বাকী থাকিয়া যায়, আর ঠিক এইখানটায়ই যত মারপ্যাঁচ। আলমের ঝরাতে যদি এগারটা পুঁটি, মনুর ছয়টা আর আলতুর মোটে তিনটা। কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে ঘণ্টাখানেক দাঁড়াইয়া ছিপ ফেলার আনন্দ সমানে ভোগ করা সত্ত্বেও আলতুর মনে হইতে থাকে, সে বড় নিঃস্ব। নিঃস্ব ভাবটা হয়ত কাটিয়া যাইত যদি গাঁয়ে ফিরিবার পথে আলমের ব্যবহারটা হইত সহানুভূতি-মাখা। কিন্তু আলম করিল কি, চোরকাঁটায় গাঁথা তার এগার পুঁটির মালায় দোলা লাগাইয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আমি ধরলাম দুই গণ্ডা তিনডা, তরা ধরলি কয়ডা ?" তারপর মনুর ছয় পুঁটির মালায় চোখ বুলাইয়া বলে, "দেড় গণ্ডা, তিনডা বড় বড় —তা ধরছস্ তুই মন্দ না। তর কয়ডারে আলতু ?" কে কয়টা মাছ ধরিল শুধু এইটুকু জানিবার জন্যই যে এই

প্রশ্ন তা নয়, কারণ ইহারা তিনজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া মাছ ধরিতেছিল, যার ছিপেই মাছ উঠুক, সকলেই একাগ্র মনোযোগে সে মাছ লক্ষ্য করিয়াছে, কে কয়টা মাছ ধরিয়াছে এ খবর তাদের কণ্ঠস্থ মায় পুঁটির আকার-প্রকার —কি পুঁটি, কোন পুঁটি, গোবরা না তিৎরে, চুনো না ময়না না কান্‌তা। তবু প্রশ্ন করিতে আলম ছাড়িল না।

আলতু তার রিক্ত মালাটি চাদরের তলায় একেবারে অদৃশ্য করিয়া দিয়া পাল্‌টা প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'হেইডা জাইন্যা তুমার কাম কি হুনি? যয়ডা পারছি, ধরছি, তুমার আইল গেল কি?' বেচারা ছেলেমানুষ, বে-কায়দায় পড়িলে ফোঁস করিয়া উঠিতে নাই চুপ করিয়া যাওয়াই সঙ্গত অতশত বোঝে না। আর এই না বোঝার দামও দিতে হইল চড়া হারে। আলম তড়াং করিয়া লাফ দিয়া আলতুর একেবারে মুখামুখী আসিয়া ভেঙচাইয়া উঠিল, "অরে আমার শীকারীরে, ধরছস্ তো জবর, মুডে তিনটা, ফিরাবার বেডাগিরি দেখ।" তারপর যুগপৎ জিভ বাহির করিয়া এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া একেবারে হাতেনাতে প্রমাণ করিয়া দিল যে আলতুর মাছ ধরবার যা বোঝে তাহার নাম কাঁচকলা। বয়সে বড়, মাথায় কয়েক ইঞ্চি উঁচু, বুকের পেশী নরম গেঞ্জি ভেদ করিয়া যেন চোখে পড়ে। আলতু আর কিছু বলিল না, নিরুত্তরে সহিয়া গেল। শুধু গায়ের লোমগুলি তাহার কয়েকবার কাঁটা দিয়া উঠিল।

কদমতলার চৌমাথা হইতে যে যার বাড়ীর পথ ধরিল। আলতুদের বাড়ী সামনেই, কাঁঠাল গাছের সারির আড়ালে তাহাদের বৈঠকখানার আটচালা দেখা যায়। আলতু সোজাসুজি সেই দিকে চলিল। ক্ষুব্ধ মন প্রতিশোধের ফিকির খুঁজতে ব্যস্ত, সম্ভব অসম্ভব ফন্দির বেড়াজালে মন আচ্ছন্ন, জগতে ভাবিবার মত আরও যে কিছু আছে এ কথা তার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। যেমনভাবেই হোক আলমকে দেখাইতে হইবে যে সে—। হঠাৎ বাধা পাইল। পাশের বেগুন ক্ষেতে আলতুদের চাকর ময়না কাজ করিতেছিল। আলতুকে ছিপ হাতে সোজা সদরের পথ ধরিতে দেখিয়া প্রথমে সে অবাক হইল, তারপর একলাফে বেড়া ডিঙাইয়া আলতুর পথ আটকাইল। "আরে কর কি মিয়া কাচারীঘরে সাহেব না বইয়া—।" বিস্ময়ে ময়না প্রায় হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল, মুখের কথা শেষ না করিয়াই আলতুর পানে সে অবাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মাথাটা আলতুর খারাপ হইয়া গেল নাকি। এতক্ষণে আলতুর সম্বিত ফিরিয়াছে। কাচারী ঘরে আলতুর বাবা বসিয়া আছেন, ছিপ হাতে সরাসরি সে-পথে গেলে তাঁহার চোখে পড়িতই। পড়াশুনার নাম নাই, সকালবেলায় ছিপ হাতে টো টো, আলতুর মাছ ধরা তিনি বাহির করিয়া ছাড়িতেন। ভাগ্যিস ময়না ছিল কী যে হইত তা না হইলে।

পেছন ফিরিয়া আলতু কদমতলার চৌমাথায় ফিরিয়া আসে। ময়নাকে বলে, "বড় ভালা করছস্ ময়না, জবর বাঁচাইয়া দিছস্ এই যাত্রা। গ্যাছলাম আর কি আর এট্টু অইলে।" ময়না সায় দেয়। তারপর দুইপাটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া ধীরে সুস্থে সে ক্ষেতের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। আর একটু হইলেই আলতু যে গিয়াছিল আজ এ বিষয়ে তাহার তিলমাত্র সন্দেহ নাই। আলতু পুব দিকের ডোবা পুকুরের পথ ধরিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। "এই ঝাম্‌সী, ইস্কুলে যাওনের বেলা অইছে, ভাত দে জল্‌দি।" কণ্ঠস্বরে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। শুনিলে আর সন্দেহ থাকে না যে মিয়া বাড়ীর বড় ছেলে, যারা গাঁয়ের ভবিষ্যৎ মোড়ল। মা রান্নাঘরেই ছিলেন। ছেলের ইস্কুলে যাওয়ার তাড়া দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন। ঝাম্‌সীকে পিঁড়ি পাতিতে বলিয়া তিনি নিজেই খাবার সাজাইতে থাকেন। আলতু ঘরে ঢুকিলে তার পায়ের দিকে তাকাইয়া বলেন "হাঁটুতক পাঁক বাবা তোমার পায়ে, হাতপাডা একবার ধুইয়া আয় না।" হ, হাত পা ধুইবার সময় আছে নাকি আলতুর, ইস্কুলের বেলা যে যায়। আসলে, শীতের সকালে ঘটির ঠাণ্ডা জলে হাত পা ধুইবার পক্ষপাতী আলতু মোটেই নয়। কন্‌কনে শীতে ঘণ্টাখানেক ঠাণ্ডা জলে দাঁড়াইয়া মাছ ধরা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। খাওয়া দাওয়া সারিয়া আলতু চলিয়া যাইতেছিল, মা চুপি চুপি বলিলেন, ছুটী হইলেই যেন বাড়ী ফেরে। বড় বড় তিনটা পুঁটি সে ধরিয়াছে, তিনি ভাল করিয়া ভাজিয়া রাখিবেন।

বই বগলে, ইস্কুলের পথে চলিতে চলিতে সমস্যাটা আলতুর মাথায় প্রকট হইয়া চাপিয়া বসিল। হোম্

টাস্কের আঁক কষা হয় নাই, অতএব প্রথম ঘণ্টায়ই নির্ঘাৎ স্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ। সে যেন হইল, এমন কিছু বড় কাজ নয়। কিন্তু সমস্যাটা হইল পুঁটি ধরিতে হইবে, এগার দুগুনে বাইশটারও বেশী। চোরকাঁটায় দুইটি মালা সে গাঁথিবে, তার একটি ডান হাতে অপরটি বাঁ হাতে লইয়া আলমের চোখের সামনে দোলা লাগাইয়া দিবে যে পুঁটি ধরিতে আলতুও জানে। কিন্তু অত পুঁটি ধরা যায় কি করিয়া?

ভাবিতে ভাবিতে আলতুর চলার গতি মন্থর হইয়া আসে। তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া বগলের বইপত্র হঠাৎ একটা ঝোপে গুঁজিয়া অদৃশ্য করিয়া দিয়া সেদিনের মত ইস্কুলের দফা করিয়া দেয়। গোল্লায় যাক্ থার্ড মাস্টারের মুখ ভেঙ্‌চানি আর স্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ। প্রমাণ সে করিবেই আলমের কাছে, যেমন করিয়া হোক যে মাছ ধরিতে সে জানে। কিন্তু উপায়টা তখন পর্যন্ত সে বাহির করিতে পারে না। শুধু উদ্দেশ্য সিদ্ধির দৃঢ় সংকল্প। বগলে বইপত্রের জঞ্জাল নাই, মনে থার্ড-মাস্টারের মুখ ভেঙ্‌চানির শঙ্কা নাই, অখণ্ড মনোযোগে সে মাছ ধরার উপায় খুঁজিতে লাগিয়া গেল। ভাবিয়া ভাবিয়া উপায়টাও সে বাহির করিয়া ফেলিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল কামারঘাটের কথা। তাই তো, অত্যন্ত সহজ উপায়, এতক্ষণ যে মনে পড়ে নাই ইহাই আশ্চর্য, মিছামিছি সে ভাবিয়া মরিতেছিল।

কামারঘাটে কামার মেয়েরা থালা বাসন মাজিতে আসে, উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জনে নোংরা থালা বাসন তকতকে ঝকঝকে করিয়া তাহারা ঘরে ফিরিয়া যায়। যখন যায় তা'দের থালা বাসনের সোনালী ঝিকিমিকি কে না দেখিয়াছে! আর এমন সব মুহূর্তও আসে চোখ যখন একেবারে ঝলসিয়া যায়। আলতুর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। একেবারে ছেলেমানুষ সে, নয়ের কোঠায় বয়স, এসবের বালাই এখনও তা'র জোটে নাই। বর্তমানে আলতুর কাছে কামার ঘাটের মহান সার্থকতা তা'র পুঁটি-সম্পদ। কামার ঘাটের তলায় যে উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জনের ছড়াছড়ি, পুঁটির ঝাঁক সেখানে কিলবিল্ করে। পুঁটি ধরায় আলমের চেয়েও যারা ওস্তাদ তাদের কতজনের মুখে কতবার আলতু শুনিয়াছে। সে অবশ্য যায় নাই কোনদিন কামারঘাটে মাছ ধরিতে। নদীর ওপারে কামারঘাট, ভেলা ঠেলিয়া যাওয়া তার সাধ্য নয়। আর অপরে লইবেই বা কেন? আলতুর বাবা জানিলে পারিলে গালমন্দ শুনিতে হইবে তাদের।

আজ কিন্তু সেখানে যাওয়া চাই-ই। আলতুদের টিনের নৌকোর চাবি থাকে ময়নার হেফাজতে। গোয়াল ঘরের গাদার ঠিক কোনখানে ময়না চাবির গোছা গুঁজিয়া রাখে সে খবর আলতু জানে। লুকাইয়া চাবির গোছাটা ট্যাঁকে পুরিতে হইবে, ছিপটা আনিতে হইবে, তারপর শামুবোনের বাড়ী হইতে চাহিয়া দু'মুঠো ভাত দুই কোঁচড়ে পুরিবে। ব্যস্, আর যায় কোথায়। আলমের চোখে সর্ষে ফুল ফুটাইয়া দিবে সে পুঁটির ঠেলায়।

মোটামুটি সোজা প্ল্যান, কাজে খাটাইতে আলতুকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। শুধু শামুবোনের কাছে ভাত চাহিতে গিয়া সামান্য একটু বিপদ হইয়াছিল। ডেগ্‌চি হইতে কাঠের হাতাটায় ভাত তুলিতে তুলিতে যেন আনমনা হইয়াই শামু জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, "হাঁ রে আলতু, ইস্কুল নাই তোর আইজ?" শুনিয়া প্রথমটার আলতু একটু হক্‌চকাইয়া যায় বটে, কিন্তু পরক্ষণে নিপুণ দক্ষতার সহিত বিপদ সে কাটাইয়া উঠে। একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শামুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া আলতু মিনতি শুরু করিয়া দেয়, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি শামু-বু, কইও না যেন কারুর কাছে। মাছ ধরনের লাগি যাইমু কিনা, হের লাগি ইস্কুলের আর গেলাম না আইজ। কইয়া দিওনা যেন বাড়ীতে—লক্ষী-বু সোনা-বু।" আরো কত কি হয়ত বলিত আলতু, কিন্তু প্রয়োজন হইল না। আলতুর গালের চাপে শামুর মাথার চুল বিস্রস্ত, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ঝড় কপালে, হাতের বাঁধনে তার গলার হার দীনতার লজ্জায় যেন মরিয়া গিয়াছে—দুই হাতে আলতুর মুখ চাপিয়া নিজের মুখের দিকে নামাইয়া আনে সে, তারপর হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া বলে, "তুই বড় ইস্কুল কামাই করস্ আলতু, আচ্ছা আইজ যা।" ভাত লইয়া আলতু চলিয়া গেলে শূন্য দাওয়াটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া শামুর বুক ভরিয়া দুলিয়া উঠে। সোনার ছেলে, কিন্তু একেবারে ছেলে-

মানুষ, এই সেদিনের আলতু, দুধের শিশু।

হাতে ছিপ, পকেটে চাবি আর কোঁচড়ে ভাত লইয়া আলতু যখন নদীর ধারে পৌঁছিল তাহার সমস্ত মন তখন কামারঘাটকে কেন্দ্র করিয়া নিবিষ্ট। তালা খুলিয়া বাঁশের খুঁটি হইতে সবে শিকল ছাড়াইয়াছে, এইবার নৌকায় পা দিবে, এমন সময় পরিচিত গলা শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। "আরে আলতু কর কি, নাও ভাসাও কেনে?" আলতু ফিরিয়া চাহিয়া বিরক্ত কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়, 'খুসী আমার, তুমার কি? নাও ত আর তুমার না।" তাহার উষ্মা দেখিয়া ফরিদ হাসিয়া ওঠে, বলে, সে তো বটেই, নৌকা আলতুদের বৈ কি, কিন্তু সে কথা তো নয়, কথা হইতেছে যে, না আছে বৈঠা না আছে লগি, নৌকা ভাসাইয়া আলতু করিবে কি? ফুরফুর করিয়া কথা বলে ছেলেটি, ভাষাটা তাহার খুব খোলতাই, কিন্তু না হইলেও ক্ষতি ছিল না। কারণ বক্তব্যটা তাহার অকাট্য। আলতুর বিরক্তি উবিয়া যায়, দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলে, তাই তো, কি আহাম্মক সে। আরো বলে কামারঘাটে সে যাইবে পুঁটি ধরিতে, কিন্তু লগি একটা চাই যে। ফরিদ বলে লগির আবার ভাবনা। কিন্তু লগি ঠেলিয়া কামারঘাটে আলতু যাইতে পারিবে তো একা একা, নাকি সেও সঙ্গে যাইবে। আলতু বলে, সেই ভাল, ফরিদ ভাইও সঙ্গে চলুক।

ফরিদও মাছ ধরিতে আসিয়াছিল। তবে ভাতের টোপে নয়। এক পুঁটুলিতে তাহার ভাতের টোপ আর একটাতে ময়দার। বয়সেরও সে অনেকটা বড়। চট্ করিয়া কোথা হইতে একটা লগি জোগাড় করিয়া আনিল সে, তারপরে দুইজনে কামারঘাটের দিকে নৌকা ভাসাইল।

কামারঘাটের খানিকটা জুড়িয়া তখন রোদ, খানিকটা ছায়ায় ঢাকা। তীরে অতি পরিচিত তেঁতুল গাছ—বাপঠাকুর্দ্দার আমলে যেমন ছিল এখনও তেমনি। শাখা প্রশাখায় নির্জীব শকুনিরা ডানা মেলিয়া মন্থর নড়াচড়ায় রোদ পোহায়, মাঝে মাঝে তারই খস্‌খস্ আওয়াজ, তাছাড়া সব স্তব্ধ। শীতের গো-মুখী নামে মাত্র নদী, আসলে লম্বিত ডোবা—আগাগোড়া নিথর, স্রোতের রেশটুকু নাই। রৌদ্র-ছায়ায় মাখানো সেই নিশ্চল জলের পানে চাহিয়া আলতুর মুখটা থম্‌থম্ করে। ঘাটের রহস্যে নয়, পুঁটির প্রবল বাসনায়। কত পুঁটিই না সে ধরিবে আজ!

তীরের কাছে নৌকা ভিড়াইয়া ফকির লগিটা এক জায়গায় পুঁতিয়া ফেলে, তারপর তাতে শিকল আটকাইয়া আলতুকে বলে "ছিপ ফালাও গো আলতু, যেথান তুমার খুশী।" আলতু পরম অভিনিবেশে জলের গভীরতা মাপিয়া আন্দাজ মত বড়শী হইতে ফাতনার দূরত্ব মাপসই করিয়া নিল, তারপর বড়শীতে টোপ গাঁথিয়া নড়িয়া চড়িয়া ঠিক হইয়া বসিয়া ছিপ ফেলিল। তাহার সমস্ত মুখাবয়ব ছাইয়া আছে, ঘটনার গুরুত্বের ব্যঞ্জনা, ওয়াটারলুর যুদ্ধ যেন মাৎ করিয়া আনিয়াছে প্রায়। আলতু ছিপ ফেলিলে পর ফরিদ অপরদিকে তাহার ছিপটি ফেলিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, মনোযোগ তাহার ছিপের চেয়ে পথের উপরেই বেশী—রাঙামাটির যে পথটি ঘাট হইতে সোজা কার্তিক কামারদের বাড়ীর দিকে চলিয়া গিয়াছে।

কামারঘাটের জলে সত্যসত্যই অনেক পুঁটি সেদিন ঘোরাফেরা করিতেছিল। হেলায় ফেলায়ও ফরিদ অনেকগুলি ওঠাইল। ফরিদের যখন আন্দাজ এক এক কুড়ি, আলতুর মোটে দুইটি। একটু আগেই আলতু ফরিদের কাছ হইতে ময়দার টোপ চাহিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ সুবিধা হয় নাই। তাহার ছিপে মাছ যে খাইতেছিল না তা নয়, কিন্তু ছেলেমানুষ, ঠিক মুহূর্তে খিঁচ দিতে না পারায় প্রতি খিঁচেই উঠিতেছিল শুধু শূন্য বড়শী। ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া অদৃষ্টকে সে বারে বারে ধিক্কার দিতেছিল আর ভাবিতেছিল ফরিদের কি কপাল। দূরদৃষ্ট যত সব তার নিজের—ফরিদ আলম ইহারা যেন ভাগ্যের বরপুত্র। দূর ছাই, না আসিলেই হইতো কামারঘাটে। আর বাবা যদি জানিতে পারেন পিঠের চামড়া আস্ত থাকিবে না।

ক্ষোভ আর বিরক্তির চরমে পৌঁছিয়া আলতু এইবার মনস্থ করিল যে ফিরিতে হইবে। ফরিদকেও বলিল। কিন্তু ফিরিয়া যাইতে ফরিদদের কিছুমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না। আলতুর তাড়া খাইয়া

হাসিমুখে সে বলে, অত ব্যস্ত হইতেছে কেন আলতু, বেশতো মাছ উঠিতেছে, ধরাই যাক না আরো কয়েকটা। বলিতে বলিতেই সে আরো একটা মাছ তুলিয়া ফেলে, তারপর বড়শী হইতে সেটা খুলিবার আগেই একবার পথের দিকে তাকাইয়া নেয়। না কোথাও কেউ নাই, পথের একধারে শুধু নেংটী পরা ধনঞ্জয় ছোঁড়া তা'র শালিকের বাচ্চার জন্য ফড়িং ধরিতেছে।

কালেভদ্রে এক আধটা পুঁটি আলতুর ছিপে উঠিতেছিল। আর ফরিদের ছিপে টপাটপ্। ফরিদ খিঁচ দিলে একটা ব্যত্যয় নাই, বড়শীতে ঝুলন্ত পুঁটি ঝিক্ ঝিক্ করে। আর আলতুর বেলায় ঠিক উলটা। কী সীমাহীন নির্দ্দয় অবিচার। তিক্ত, বিষাক্ত মন আলতু থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। অথচ জোর করিয়া ফরিদকে ফিরিয়ে যাইতে বাধ্য করিতেও তাহার মন সায় দিতেছিল না—কোথায় যেন বাধে। আলতু যেন বুঝিতে পারে, পীড়াপীড়ি করিলে ফরিদ-ভাই বিশেষ আপত্তি তুলিবে না, কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হইবে না, হাসিমুখে বলিবে, "আচ্ছা, চল যাওয়াই যাক্।" আর এই বুঝিতে পারার জন্য ফরিদকে বাধ্য করিতে তাহার বাধিতেছিল। সে-ও ফরিদের সমান-সমান মাছ ধরিতে থাকিত তাহা হইলে অবশ্য কথা ছিল স্বতন্ত্র, ফরিদকে অনায়াসেই সে ফিরিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে পারিত। কিন্তু তাহা আর হইল কোথায়? আর যদি হইতই বা, আলতু তখন ফরিদকে পীড়াপীড়ি করিবেই বা কেন? বরঞ্চ ফরিদকেই এক সময় তাড়া লাগাইতে হইত ফিরিবার জন্য।

পথের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া ফরিদও নিরাশ হইয়া পড়িতেছিল। ঘাটে এত লোক আসিল গেল, কিন্তু সেই মানুষটির হইল কি? কার্তিক কামারদের সোনাবীর? বেলা পড়িয়া আসিতেছে। এইবার ফিরিতেই হইবে। আলতুর চোর কাঁটার মালায় পুঁটির সংখ্যা আট। মোটে আটটি পুঁটি দিয়া আলমের কাছে প্রমাণ করা যাইবে না। মিছামিছি কামারঘাটে সারাটা দিন সে কাটাইল।

ফরিদের মনটাও ভাল নয়। কোথায় ওপারের বেতের ঝোপের আশেপাশে বোলতার টোপে ছিপ ফেলিয়া কই মাছ মাগুর ধরিবে না। মিছামিছি কতকগুলি পুঁটি ধরিয়া আর কামারঘাটের উনি পোকার কামড় খাইয়া দিনমানটা শেষ করিয়া দিল। তবু যদি সে একটিবার শুধু আসিত। সোনাবীর দেখা মিলিল না, ফরিদকে আসলে কাটিয়াছে শুধু এই একটি ঘটনাই, কই মাগুর না ধরিয়া খালিখালি কতকগুলি পুঁটি ধরিল আর না-হক বসিয়া উনি পোকার কামড় খাইল—এই সব হইল নুনের ছিটা। আর কই মাগুর সে যে ধরিতই আজ তারই বা নিশ্চয়তা কি? একেবারে পুরাপুরি সুনিশ্চিত যাহা তাহা এই যে, সোনাবী একবারও ঘাটে আসে না।

আসে নাই তো আসে নাই—মরুক্ গে ছুঁড়ী। নুন ছিটাইয়া বেশীক্ষণ বা জীয়াইয়া রাখা ফরিদের স্বভাবই নয়। হঠাৎ চটপট উঠিয়া লগি হইতে শিকল খুলিয়া পোঁতা লগি টানিয়া তুলিয়া সে নৌকা ভাসাইয়া দিল; তারপর গলা ছাড়িয়া জুড়িয়া দিল গান—একেবারে অজ ভাটিয়ালি। দেখিয়া শুনিয়া আলতুর গা রি রি করিয়া উঠিল। গা তাহার আগাগোড়াই জ্বলিতেছিল, অতএব থাকিয়া থাকিয়া রি রি করিয়া উঠা স্বভাবের নিয়মে অনিবার্য; ফরিদ গান জুড়িয়া না দিলেও হয়ত অন্য কোনও একটা ছুতায় গা রি রি করিয়া উঠিত। তবু ফরিদের গানটার উপর সিংহবিক্রমে লাফাইয়া পড়িতে আলতুর কিছুমাত্র দ্বিধা হইল না। "চেল্লাও কেনে ষাঁড়ের মতন?" শুনিয়া ফরিদ বড় লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে যে গাইতে জানে না, শুধু চেঁচাইতে পারে, কথাটা সত্য। ফরিদ নিজেও তা জানে। এই জানার জন্যই লজ্জাটা তাহার বড় মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিল। শেষে কিনা আলতুর মত কচি ছেলে তাহাকে মুখ ভেংচাইয়া শিখাইয়া দিল যে সে গায় না শুধু ষাঁড়ের মত চেঁচায়। এই চেঁচাইবার দুর্বুদ্ধি তাহার হইয়াছিল কেন?

দু'জনেই চুপচাপ। ফরিদ তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া লগি ঠেলিতেছে—যত শীঘ্র সম্ভব ঘাটে নৌকা লাগাইয়া আলতুর সামনে হইতে পালাইয়া সে যেন বাঁচিতে চায়। আলতুর মনটা একান্ত অবসাদে ম্রিয়মান, তাতে না আছে বর্ণ, না আছে বৈচিত্র্য—শুধু ধূসর

একাকার। নৈরাশ্য আর ক্ষোভের ঝড় সারাটা দিন ধরিয়া মনের ডালপালাগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মনটাকে যেন তাহার একেবারে রিক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। শুধু একটা ভাবনা থাকিয়া থাকিয়া এই রিক্ততাকে আরো বেশী স্পষ্ট করিয়া দিতেছিল। ফরিদ ভাই গলা ছাড়িয়া গান জুড়িয়াছিল তো জুড়িয়াছিল, সে কেন এমন তাড়া লাগাইয়া তাহা বন্ধ করিতে গেল।

নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। আলতুর মাছ ক'টা চোর কাঁটায় গাঁথাই ছিল। ফরিদের মাছ নৌকার তলায় জলে মরি মরি করিতেছে—দু'একটা মরিয়াও গিয়াছে। মাছগুলি আবার তুলিতে হইবে—সে আর এক আপদ। কাঁধের গামছাটা গলুইয়ের পাটাতনে পাতিয়া ফরিদ মাছগুলি তাহাতে তুলিতে লাগিল। আলতুও এখানে ওখানে হাতড়াইয়া কয়েকটা মাছ গামছায় তুলিয়া ফেলিল। মাছ তোলা শেষ হইলে ছিপ ও মাছ আলতুর হাতে দিয়া তাহাকে সে নৌকা হইতে নামাইয়া দিল। তারপর নৌকাটা খুঁটির কাছে ঠেলিয়া শিকল আটকাইয়া নিজেও নামিয়া পড়িল। আলতুর কাছে আসিয়া বলিল "ছিপটা তোমাদের বাড়ীতেই লইয়া যাও আলতু, রহিমপুরে একটু কাম আছে আমার হেইখানে যাইমু এখন।" আলতু বলে, "তুমার মাছ?" ফরিদ বলে, "মাছ আইজ তুমিই নেও, কয়ডাই বা মাছ!" বলিয়াই সে রহিমপুরের দিকে চলিতে শুরু করিয়া দিল। আলতু তাহার দুই কানকে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না। ফরিদভাই বলে কি! চেঁচাইয়া পিছু ডাকে সে, "ও ফরিদভাই, হুন হুন তুমাগো বাড়ীতে পাঠাইয়া দিমু নাকি মাছ—।" ফরিদ হঠাৎ ফিরিয়া আসে। তাহার মনে হয় আলতুর হয়ত মাছ লইতে আপত্তি আছে। ফিরিয়া আসিয়া আলতুর পিঠে হাত দিয়া অনুরোধের স্বরে বলে, আলতু নিক আজ ও ক'টা মাছ, আর ভারী তো মাছ—আরেকদিন না হয় দুজনে খুব আচ্ছা করিয়া মাছ ধরিবে—খুব ভাল ভাল মাছ, কই, মাগুর, গুলসা, লাটি কেমন? আলতু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানায়, "আচ্ছা", ফরিদ আবার রহিমপুরের দিকে চলিতে শুরু করে।

বাড়ীর পথে কিছুদূর আগাইয়া আলতু থামিয়া পড়ে। মাছের পুঁটুলিটা হাত হইতে ঘাসের উপর এক জায়গায় নামাইয়া রাখিয়া নিজের ধরা মাছগুলি চোরকাঁটা হইতে খুলিয়া তাহাতে মিশাইয়া ফেলে। তারপর মাছের দিকে সে তাকাইয়া থাকে এক দৃষ্টে। এগার দুগুণে বাইশটা নয়, এক গাদা পুঁটি। চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনের অনুভূতি এমন এক স্তরে গিয়া পৌঁছায় যাহা ভাষার একেবারেই নাগালের বাহিরে।

ফজলুল হকের ভাষায় কোন চোখ ঝলসানো চাকচিক্য নেই, নেই অভিনবত্বের ঝলসানি। অত্যন্ত নিরাভরণ তাঁর ভাষা, শহরতলীর সহজ সুন্দরীর মত। আমাকে মুগ্ধ করেছিল ফজলুল হকের অন্তর্দৃষ্টি ও অসামান্য পরিমিতি-বোধ।

—শামসুর রহমান

রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্পের ভূমিকা

তপোব্রত ঘোষ

ডক্টর জনসন একবার বস্‌ওয়েলকে বলেছিলেন "...it is wonderful that six thousand years have now elapsed since the creation of the world, and still it is undecided whether or not there has ever been an instance of the spirit of any person appearing after death. All argument is against it, but all belief is for it". সমস্ত যুক্তিবিচার যার বিরুদ্ধে, তারই পক্ষে সমস্ত বিশ্বাস। এর কারণ আর কিছুই নয়, মানুষ ভয় পেতে ভালবাসে—যাকে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ বলেছিলেন 'strange human craving for feeling afraid'। গল্পগুচ্ছের 'অতিপ্রাকৃত' গল্পগুলি রচনার কাছাকাছি সময়ে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অতিপ্রাকৃত' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও অনেকটা এই ধরণের কথা বলেছিলেন, "অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; অবিশ্বাস মানুষের উপার্জিত"।১

একটু চিন্তা করলেই ধরা পড়বে যে, অতিপ্রাকৃতে এই ভয় আর বিশ্বাস শুধু ব্যক্তিবিশেষের শৈশবেই সীমাবদ্ধ নয়, 'সমষ্টিগত' শৈশবের নিগূঢ়-গভীর অন্ধকারে তা বহুদূর পরিব্যাপ্ত। সেই আদিম মানুষের সমস্ত গল্পই তাই অতিপ্রাকৃত গল্প। কারণ প্রাকৃত নিয়মশৃঙ্খলিত বৈজ্ঞানিক বিশ্বের ধারণাই তার কাছে পরিস্ফুট নয়। মৃত্যুর একবছর আগে রবীন্দ্রনাথ যখন শেষবারের মতো ফিরে তাকালেন তাঁর 'ছেলেবেলা'র দিকে, তখন সেই 'অতীতের প্রেতলোকে' দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাঁর মনে হয়েছিল, "তখনকার প্রদীপে যত ছিল আলো, তার চেয়ে ধোঁয়া ছিল বেশি। বুদ্ধির এলাকায় তখন বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয় নি, সম্ভব-অসম্ভবের সীমা-সরহদ্দের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো"। এ শুধু রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাই নয়, তলিয়ে দেখলে, সমস্ত শিশুর নিত্যবর্তমান শৈশব। সম্ভবই-অসম্ভবে জড়ানো সেই শৈশবের অতিপ্রাকৃতসংস্কার যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর 'বালভাষিত গদ্যে' ঃ "রাত্রি নটা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলুঢুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহির মহল থেকে বাড়ির ভিতরে যাবার সরু পথ ছিল খড়খড়ির আব্রু দেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিট্‌মিটে আলোর লণ্ঠন। চলতুম আর মন বলত, কী জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূতপ্রেত ছিল গল্পেগুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে কানাচে। কোন দাসী কখন হঠাৎ শুনতে পেত শাঁকচুন্নীর নাকী সুর, দড়াম্‌ করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ....বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘনপাতাওয়ালা বাদাম গাছ, তারই ডালে এক পা আর অন্য পা'টা তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন্‌ মূর্তি। তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। ...সেসময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলেছিল যে, টেবিলের নীচে পা রাখলে পা সুড়সুড় করে উঠত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। নীচের তলায় সেই-সব স্যাঁৎসেঁতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করেছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মতো, পা দুটো উল্টো দিকে। সেই ভুতুড়ে ছায়ার সামনে দিয়ে যখন বাড়ি-ভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগাত তাড়া।"

'Totem and Taboo' গ্রন্থে ফ্রয়েড্‌ ভূতের গল্পের প্রতি সর্বসাধারণের অদম্য আকর্ষণের মূল সূত্রটি খুঁজে পেয়েছিলেন এইখানেই। অর্থাৎ, তাঁর দৃষ্টিতে, মগ্নচৈতন্যে প্রচ্ছন্ন মানুষের নিত্যসঙ্গী ঐ আদিম বিশ্বাসই এই আকর্ষণের মুখ্য হেতু। ফ্রয়েড্‌ বলছেন

"We appear to attribute an 'uncanny' quality to impressions that seek to confirm the omnipotence of thought and the animistic mode of thinking in general, after we have reached a stage at which, in our judgement, we have abandoned such beliefs."

কিন্তু একথা মেনে নিলেও আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আধুনিক যুগে মানুষের বুদ্ধির এলাকায় যখন বৈজ্ঞানিক সার্ভে শুরু হয়েছে, তখন অতিপ্রাকৃতকে কেন্দ্র করে মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাস আর উপার্জিত অবিশ্বাসের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। হারিয়ে-যাওয়া ছেলে-বেলার দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত স্বীকার করেছেন, "সেই বাদামগাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পা-ফাঁক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকতেও সেই ব্রহ্মদত্যির ঠিকানা আর পাওয়া যায় না। ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।"

আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই 'ভিতরে বাইরে' আলো বেড়ে যাওয়ার ফলে আধুনিক পৃথিবীতে অলৌকিক গল্পের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু সত্য ঠিক এর বিপরীত। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালসীমা ইংরেজী কথাসাহিত্যে ভূতের গল্পের সুবর্ণযুগ নামে চিহ্নিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য 'অতিপ্রাকৃত' গল্পগুলিও এই কালসীমার মধ্যেই রচিত। কিন্তু আধুনিক যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান-মনস্কতার যুগে অতিপ্রাকৃতের এই ঐশ্বর্যময় প্রস্ফুরণ অপ্রত্যাশিত বলেই বিস্ময়কর। ফ্রয়েডের প্রাগুক্ত মন্তব্যের সূত্র ধ'রে সাম্প্রতিককালের গবেষক শ্রীমতী Julia Briggs এই ঘটনার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে দুই বিপ্রতীপ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নিয়ত-সংঘর্ষের উপরেই আধুনিক ভৌতিক গল্পের শিল্পরূপ গড়ে উঠেছে : "...The form depends upon the existence of a tension between an outmoded, but not entirely abandoned belief and an enlightened scepticism, such tension was notably present in the last century, when the material and spiritual conceptions of life were locked in a continuous conflict which no intellectual could entirely avoid".২ Briggs দেখিয়েছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপে একদিকে যেমন খ্রীষ্টধর্মের যাবতীয় অতিপ্রাকৃতসংস্কার আক্রান্ত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে যুক্তিবাদ আর জড়বাদের প্রতিক্রিয়ায় একের পর এক গড়ে উঠেছে psychic society আর spiritualistic church। বিশেষত, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কে Fox-ভগ্নীযুগলের আকস্মিক আবিষ্কারের ফলে প্রথম জানা গেল যে প্রেতের অস্তিত্বই শুধু সত্য নয়, প্রেতের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ ও সংবাদ-পরিবহনও না কি সম্ভব! ডারউইনের অভি-ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়াবশত সাধারণ জনমানসে এই ঘটনা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করল। শুরু হ'ল spiritualism : প্রেততত্ত্ববিদ্যা। এই প্রসঙ্গে য়ুরোপীয় অতিপ্রাকৃতবিশ্বাসের ইতিহাস রচয়িতা Peter Haining মন্তব্য করেছেন : "In a few years, conversing with spirits—by rapping, automatic writing, speaking while under hypnosis, and finally, by manifestation when the ghost appeared in visible form—became a craze throughout America and Europe."৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীমানসেও ঐ 'enlightened scepticism' আর 'outmoded belief' -এর দ্বন্দ্ব নিত্যজাগ্রত ছিল। একদিকে ডিরোজিও অনুপ্রাণিত নব্যবঙ্গীয় যুক্তিবাদ, অক্ষয়কুমার দত্তের যান্ত্রিক জড়বাদ, কোঁৎ-বেন্থাম অনুসরণকারী বুদ্ধিজীবী বাঙালীর ধ্রুববাদ আর হিতবাদ অন্যদিকে মাদাম ব্লাভাট্স্কি আর কর্ণেল অল্কট্ পরিচালিত ভারতের থিওসফি-আন্দোলন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে প্রথম ভারতীয় থিওসফি-ক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। একদা-হিন্দুকলেজের ছাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র এই সংস্থায় যোগদান করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে প্যারীচাঁদ ও তাঁর সহধর্মী

কয়েকজন বন্ধু কলকাতায় স্থাপন করলেন 'ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশন্ অফ্ স্পিরিচুয়ালিস্টস্'। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির যে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন এর সহকারী সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর কাশিয়াবাগানের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন মাদাম ব্লাভার্টস্কি আর অল্‌কট্। স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মহিলা-শাখার প্রেসিডেন্ট। তাঁর বাড়িতেই এর অধিবেশন বসত। স্বর্ণকুমারীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষালও ছিলেন থিয়সফিস্ট-সম্প্রদায়ভুক্ত। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে 'থিয়সফিস্ট আত্মীয়'র একটি চরিত্র আছে। অমল হোম-কে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে, এই চরিত্রটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের আদলে গড়া। ঠাকুরবাড়িতে থিয়সফি-চর্চার যুগে মোহিনীমোহন এই বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদাম ব্লাভাট্স্কির সেক্রেটারী হ'য়ে মোহিনীমোহন য়ুরোপ গিয়েছিলেন।

তবে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়, ঠাকুর পরিবারে থিয়সফির প্রভাব খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে স্বর্ণকুমারী-কন্যা সরলা দেবী বলেছেন, "মাদাম ব্লাভাট্স্কির প্রতি শ্রদ্ধায় যখন মান্দ্য পড়ল, থিয়সফির দল ভঙ্গ হ'ল, তখন থিয়সফির সূত্রেই যাঁদের সঙ্গে পরিচয় আরম্ভ হয়েছিল, সেইসব মহিলাদের নিয়ে 'সখিসমিতি' নাম দিয়ে মা একটি সমিতি স্থাপন করলেন।" 'সখিসমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। নামটি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরলোকচর্চা নয়, নারী কল্যাণ ও সমাজ সেবাই এই সমিতির লক্ষ্য হ'ল।

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপ্ত ক'রে এই জড়বিদ্যা আর পরাবিদ্যার অনুক্ষণ দ্বন্দ্ব—Briggs-এর ভাষায়, 'material and spiritual conceptions of life'-এর 'continuous conflict'—'অতি প্রাকৃত' গল্পরচনার আগে রবীন্দ্রমানসেও লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সমালোচনা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অনেক মিথ্যা, কবিতায় আমাদের মিষ্ট লাগে। ...আজ তাহা আমি মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছি, অর্থাৎ জ্ঞান হইতে তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু হৃদয়ে সে এমনি শিকড় বসাইয়াছে যে, সেখান হইতে তাহাকে উৎপাটন করিবার জো নাই। কবি যে ভূত বিশ্বাস না করিয়াও ভূতের বর্ণনা করেন, তাহার তাৎপর্য কি? তাহার অর্থ এই যে, ভূত বস্তুত সত্য না হইলেও আমাদের হৃদয়ে সে সত্য। ভূত আছে বলিয়া কল্পনা করিলে যে আমাদের মনের কোন্‌খানে আঘাত লাগে, কত কথা জাগিয়া উঠে, অন্ধকার, বিজনতা, শ্মশান, এক অলৌকিক পদার্থের নিঃশব্দ অনুসরণ, ছেলেবেলাকার কত কথা মনে উঠে—এ সকল সত্য যদি কবি না দেখেন তো কে দেখিবে?" 'জ্ঞান' আর 'হৃদয়ের' দ্বন্দ্বটি এখানে স্বয়ম্প্রকাশ। 'মালতী পুঁথি'র একটি পৃষ্ঠায় পাওয়া গিয়াছে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের পরলোকচর্চার একটি সম্পূর্ণ অনুলেখন। আবার 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যাচ্ছে, প্রথমবার বিলাত প্রবাসে ডাক্তার স্কটের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের 'টেবিল-চালা'র একটি ঘটনার কথা। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই তা 'ছেলেমানুষী কাণ্ড'। অবিশ্বাসে, কৌতুকে, বিদ্রূপে মুখর সেই বিবরণ। অন্যদিকে, ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণে প্রকাশিত 'সাধনা'র যে প্রথম সংখ্যাটি থেকে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের উজ্জ্বলতম পর্বের সূত্রপাত, সেই সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ আদিব্রাহ্মসমাজের আচার্য হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'প্ল্যাঞ্চেট' নামে একটি রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। সেই পরিচয়দানের ভাষাভঙ্গীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস প্রবণতাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

'অতিপ্রাকৃত' বিষয়ে রবীন্দ্রমানসের এই নিত্য-সঞ্চলিত দোলাচলতার মধ্য দিয়েই যেন গল্পগুচ্ছের এই পর্যায়ের গল্পগুলির সামগ্রিক আবহটি আমাদের কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'The Uncanny' প্রবন্ধে ফ্রয়েড্ আধুনিক ভূতের গল্পে গল্পকারের ঐ দ্বি-মুখিতার দিকে প্রথম অঙ্গুলি-নির্দেশ করেন। গল্পকারের সংশয় আর অবিশ্বাস যেন গল্পের সূত্রপাত থেকেই পাঠকের সংশয় আর অবিশ্বাসকে

সুকৌশলে নির্জিত করে ফেলে। অবশেষে পাঠক যখন অতিপ্রাকৃত উপলব্ধিতে একাত্ম হয়ে যায়, তখন গল্পকারের সহাস্যকৌতুকে হঠাৎ ছিঁড়ে যায় সেই অলৌকিকের মায়াজাল। 'ভিতরে বাইরে' আলো এসে পড়ে। এই উভবল দ্বিধাখণ্ডনই প্রাচীনকালের শিশু-লোভন ভৌতিক কাহিনী থেকে গল্পগুচ্ছের আধুনিক 'অতিপ্রাকৃত' গল্পগুলিকে বিশিষ্ট রসরূপে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

এই প্রসঙ্গে এযাবৎ-রবীন্দ্র রচনাবলী-বহির্ভূত৪ একটি রবীন্দ্ররচনা উল্লেখযোগ্য। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের 'সাধনা' পত্রিকায় ১৬৬-৬৭ পৃষ্ঠায় 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বিভাগে 'ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। যথা সম্ভব রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই এই বিবরণ পুনরুদ্ধার করা যাক্।

স্যার এড্‌মণ্ড্ হর্নবি চীন এবং জাপানের সর্বোচ্চ কন্সুলার কোর্টের প্রধান জজ ছিলেন। নাইন্টীন্থ সেঞ্চুরি পত্রিকায় তিনি তাঁর জীবনের একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা প্রকাশ করেছেন। হর্নবি মকর্দ্দমায় যে রায় লিখতেন, সন্ধ্যার সময়ে খবরের কাগজের সংবাদদাতারা এসে সেই রায় চেয়ে নিয়ে যেত এবং পরের দিন সংবাদপত্রে প্রকাশ করত। একদিন তিনি রায় লিখে তাঁর খান-সামার কাছে রেখে দিয়েছিলেন। কথা ছিল, যখন সংবাদদাতা আসবে, ভৃত্য এই রায় তাকে দেবে। জজ সাহেব রাত্রে নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে শয়নগৃহের দ্বারে আঘাত শুনে জেগে উঠলেন। বুঝতে পারলেন, গৃহে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষা করে কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি প্রবেশ করার আদেশ দিলে সেই খবরের কাগজের সংবাদদাতা গৃহে প্রবেশ করে রায় প্রার্থনা করল। এই অনধিকার-প্রবেশে ক্রুদ্ধ হর্নবি ভৃত্যের কাছ থেকে তাকে রায় চেয়ে নিতে আদেশ করলেন। কিন্তু সে বারবার একই প্রার্থনা করতে লাগল। কতকটা তার অনুনয়ে বিচলিত হয়ে, কতকটা লেডি হর্নবির ঘুম ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কায় হর্নবি শেষপর্যন্ত সংক্ষেপে তাঁর রায় মুখে মুখে ব'লে গেলেন। সে লিখে নিল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে চলে গেল। তখন রাত্রি দেড়টা। অনতিবিলম্বে লেডি হর্নবি জেগে উঠলেন ও হর্নবি তাঁকে সমস্ত ঘটনাটি বললেন। পরদিন জজ সাহেব আদালতে গিয়ে খবর পেলেন যে সেই সংবাদ-দাতা পূর্বরাত্রে একটা থেকে দেড়টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করেছে এবং সেইরাত্রে সে গৃহত্যাগ করেনি। ইন্‌কোয়েস্ট পরীক্ষায় হৃদ্‌রোগই তার মৃত্যুর কারণ বলে স্থির হয়েছে। এই ঘটনাটি প্রকাশিত হলে সাধারণের মনে অত্যন্ত বিস্ময় উদ্রেক করল। কারণ হর্নবি একটি বড় আদালতের বড় জজ। প্রমাণের সত্যমিথ্যা সূক্ষ্মভাবে অবধারণ করাই তাঁর কাজ। নিজের সম্বন্ধে হর্নবি বলেছেন যে তিনি পুরুষানুক্রমে আইনব্যবসায়ী, কল্পনাশক্তিপরিশূন্য এবং অলৌকিক ঘটনার প্রতি বিশ্বাসবিহীন।

এই কাহিনীটি উদ্ধার করবার পরে রবীন্দ্রনাথ একটি পরিশিষ্ট সংযোজন করেছেন। নাইন্টীন্থ সেঞ্চুরী পত্রিকায় হর্নবির বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার চার মাস পরে নর্থ চায়না হেরাল্ডের সম্পাদক ব্যাল্‌ফোর সাহেব তাঁরই পত্রিকায় একটি প্রতিবাদপত্র প্রকাশ করেন। ব্যাল্‌ফোরের মতে, প্রথমত, হর্নবি-বর্ণিত বিবরণে দেখা যায় যে লেডি হর্নবি তখন জীবিত ছিলেন। কিন্তু ঐ ঘটনার দু'বছর আগেই তিনি গত হন, এবং ঐ ঘটনার চার মাস পরে হর্নবি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয়ত, হর্নবি ইন্‌কোয়েস্ট পরীক্ষার কথা বলেছেন; কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা যাচ্ছে যে আদৌ তা হয় নি। তৃতীয়ত, হর্নবি যে-দিনটিকে তাঁর রায় প্রকাশের দিন ব'লে উল্লেখ করেছেন, আদালতের গেজেটে সেদিন কোনো রায় প্রকাশিত হয় নি। চতুর্থত, হর্নবির মতে, ঐ সংবাদ-দাতার মৃত্যু হয় রাত্রি একটায়। কিন্তু তা মিথ্যা। পরের দিন প্রাতঃকালে ৮টা/৯টার সময়ে সে প্রাণত্যাগ করে। রবীন্দ্রনাথ উপসংহারে মন্তব্য করেছেন, "ইহার পর অলৌকিক ঘটনার প্রামাণ্য সাক্ষ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।" ছোট্ট এই টিপ্পনীটুকুর মধ্যে একটি চাপা হাসি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের এই স্বল্পজ্ঞাত রচনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করবার একটি হেতু আছে। লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে যে, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত 'অতিপ্রাকৃত' গল্পগুলির শিল্পরূপ বীজাকারে এই রচনাটির মধ্যে ধরা পড়েছে।

'কল্পনাশক্তি-পরিশূন্য' এবং 'অলৌকিক ঘটনার প্রতি বিশ্বাসবিহীন' একটি মানুষের সামনে প্রেতের আবির্ভাব হয়। বিভ্রান্তি আর বিস্ময় যখন তুঙ্গে আরোহন করে, তখন হঠাৎ স্তরে স্তরে যুক্তিবিশ্লেষণে ভেঙে যায় সেই আবেশ। হর্নবি আর ব্যাল্‌ফোরের এই প্রতিমুখী অবস্থান নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের গল্পমালায়। কখনো তারা 'ক্ষুধিত পাষাণের' থিয়সফিস্ট আত্মীয় আর অবিশ্বাসী গল্পকার। কখনো তারা 'মণিহারা'র ইস্কুলমাস্টার আর ফণিভূষণ সাহা। আবার কোথাও বা এই দুই পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্ব একই ব্যক্তির চরিত্রে সমীকৃত হয়েছে। যেমন দিবা-ভাগের যুক্তিবাদী দক্ষিণাচরণ আর 'নিশীথে'র ভূতগ্রস্ত দক্ষিণাচরণ। আর 'কঙ্কাল' গল্পে স্বয়ং গল্পকারের মধ্যেই এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্রুত-আবর্তিত আলোছায়া একটি স্বতন্ত্র মাত্রা অর্জন করেছে। 'সাধনা' পত্রিকায় হর্নবির গল্প উদ্ধৃত হবার ঠিক দু'মাস পরেই প্রকাশিত হয় 'কঙ্কাল'। দুটি ক্ষেত্রেই শয়নকক্ষে প্রেতের আবির্ভাবের বিশেষ মুহূর্তটি এবং না-পাওয়া অভীষ্ট বস্তুর জন্য অবিরত অনুসন্ধানরত প্রেতের চরিত্রের মধ্যে প্রাথমিক সাদৃশ্যটুকু লক্ষণীয়।

উল্লেখপঞ্জী

১। 'অতিপ্রাকৃত-প্রথম প্রস্তাব' : 'সাধনা', ফাল্গুন ১৩০০ ॥ রামেন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড / বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ / দ্বিতীয় মুদ্রণ / পৃঃ ২০০।

২। Night Visitors : The Rise and Fall of the English Ghost Story / Julia Briggs / Faber / 1979 / P : 16.

৩। 'Ghosts : The Illustrated History'/ Peter Haining / Sidgwick and Jackson / Reprinted 1979 / P : 72.

৪। সম্প্রতি অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য এই রচনাটি প্রকাশ করেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য' [দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১] গ্রন্থের ৩৭৫-৩৭৭ পৃষ্ঠায়।

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা (১৯৭৭-৭৮)-এ তপোব্রত ঘোষের পরিচয় :

'বাংলায় এম. এ. পড়েন। হাতের লেখা দেখে প্রেসওয়ালারা ভীষণ খুশী।'

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ঃ এক নির্জন ব্যক্তিত্ব

গার্গী দত্ত

"খোয়াই, আর তাতে একটি সলিটারি তালগাছ। ব্যাস্। আমার স্পিরিট, আমার জীবনের মূল ব্যাপারটা যদি কোথাও পেতে হয়, ওতেই পাবে। বলতে পার —ওটাই আমি।" বলেছিলেন শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। হ্যাঁ, সত্যিই এক আশ্চর্য নির্জনতা ছেয়ে থাকে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর সৃষ্টি—যেন কোনো দিগন্ত-বিস্তারী প্রান্তরের ওপারে তাঁর একক দৃষ্টি নিবদ্ধ, যে পথে তিনি পা রাখছেন তা কেবল তাঁর নিজস্ব হেঁটে চলার পথ। বিনোদবিহারীর শিল্পচেতনা কোনো অজ্ঞাতপূর্ব সৌরভের মত উত্থিত হ'ল, আচ্ছন্ন ক'রে রাখল আমাদের—যাতে মিশে মিশে গেছে বীরভূমের রুক্ষ পাথুরে মাটির গন্ধ, মিশে গেছে দূরতর প্রাচ্যের আভাসিত চেতনা, মিশে গেছে সমকালীন পাশ্চাত্য শিল্পচর্চার সজীবতা। বিনোদবিহারীর ব্যক্তিত্ব এইসব আপাত-নৈকট্যবিহীন খণ্ডতাকে গেঁথে নিয়ে সৃষ্টি করল একটি পরিপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পচেতনা, দান করল তাঁর শিল্পরূপে এক অনন্য বিশিষ্টতা। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর শিল্প মননে বিশেষ, স্বতন্ত্র এবং হ্যাঁ, সম্পূর্ণ একাকী।

বিনোদবিহারীর যাত্রা যে নিরন্তর নির্জন পথেই আমৃত্যু, তা বোধ হয় সূচিত ছিল তাঁর জন্মসময় থেকেই। তিনি জন্মেছিলেন এক লম্বা অনিশ্চিতের ছায়ার মধ্যে—জন্মকালেই তাঁর একটা চোখ ছিল প্রায় নষ্ট এবং আরেকটা চোখের দৃষ্টিশক্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। প্রকৃতি তাঁকে জীবনের প্রারম্ভেই এই নির্জনতার ঘেরাটোপ পরিয়ে দিলেন, আঙুলে দিলেন শিল্পীর দক্ষতা, মনে শৈল্পিক চেতনা, সুচারু সৌন্দর্যবোধ ; বস্তুতঃ, তাঁকে এমন ভাবে তৈরী করলেন যাতে তিনি চিত্রকর ছাড়া আর কিছু হ'তেই পারেন না, অথচ—কি আশ্চর্য—অথচ, কি তৎপর নিষ্ঠুরতায় তাঁর দু'চোখে ভরে দিলেন দুর্বিভেদ্য অন্ধকার! অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন শিল্পী বিনোদবিহারী। এর চেয়ে মর্মন্তুদ কোনো অভিশাপের কথা আমরা ভাবতে পারি না।

হ্যাঁ, চিত্রকর ছাড়া আর কিছু হওয়া বিনোদবিহারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। শৈশব থেকেই তিনি চিত্রকরের চোখেই দেখেছেন এই রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধময় জগৎ। বলা যেতে পারে, "he used to think in terms of pigments"। তাঁকে বাড়ীর লোকে বলে, "দেখে আয় তো কে ডাকছে বাইরে?" তিনি ভেতরে এসে বলেন, "একটা লোক, সবুজ পাড় কাপড়, একটা কোট ও গায়ে চাদর, হাতে লাঠি।" প্রতিবেশী হরেনবাবুকে তিনি মনে রাখেন কারণ তাঁর গায়ের রং কালো, তার "কালো জুতো, কালো বাঁশি—কেবল বাঁশির ভেতরটা টকটকে লাল।" বাড়ীতে এসে কোনো আবিষ্কারকের উচ্ছ্বাসে বলে ওঠেন, "রাস্তায় একটা লোক দেখলাম, তার জামা ডোরাকাটা," সাদা নয়। লক্ষ্য করেন সুতীব্র মনোযোগে মুচি কিরকম ক'রে জুতো সেলাই করে, মুগ্ধ হ'য়ে যান মেয়েদের হাতে রঙিন চুড়ির বর্ণতরঙ্গ দেখে, কুসুম-ঝি'র সাথে দাওয়ায় বসে ঠোঙা তৈরী করেন। তাঁর বয়সী সকলেই যায় স্কুলে—তিনি যান না। তাঁর সঙ্গীহীন সময় কাটে যথেচ্ছ বই পড়ে আর ছবি এঁকে। এক অ-স্বাভাবিক নির্জন শৈশব ছিল বিনোদবিহারীর।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এলেন বিনোদবিহারী, যিনি তাঁর এক নতুন জন্ম দিলেন ঃ নতুন চেতনা, নতুন জাগরণ হল তাঁর। "যার চোখ নেই সে কি ক'রে এই লাইনে……"—এমন সংশয় পোষণ করেছিলেন নন্দলাল বসু। বিনোদবিহারীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো উজ্জ্বল ধারণা ছিল না বলেই হয়তো তাঁর দিকে অত মনোযোগও দিতেন না তিনি। সত্যি কথা বলতে কি, এই ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ছাত্রের প্রতি তিনি

বেশ অবহেলাই প্রদর্শন করেছিলেন প্রথমদিকে। আর একথাও সমান সত্য যে রবীন্দ্রনাথ না থাকলে শান্তিনিকেতনের কলা-ভবনের ছাত্র হবার সুযোগ পেতেন না বিনোদবিহারী। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে "নিজের পথ নিজে খুঁজে নেবার" সুযোগ দিয়েছিলেন। বিনোদবিহারী নিজের পথ নিজে খুঁজে পেয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনের রুক্ষ সৌন্দর্য বিনোদবিহারীর শিল্পবোধিতে একটি অনিবার্য প্রভাব। প্রকৃতি কেবল মাত্র সৌন্দর্যচেতনায় নয়, তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বে রেখেছিল তার স্পর্শ। ওই কঠিন লালমাটি, ওই দিগন্তে-মিশে-যাওয়া প্রান্তর, নিস্তব্ধ খোয়াইয়ের ধার, ঋজু শালবনের মর্মরিত দীর্ঘশ্বাস —সব কিছুই তাঁর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে, মিশে গেছে তাঁর মননে, তাঁর চিন্তায়। গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন চারপাশ স্তব্ধ, যখন কেবল ক্লান্ত কুকুরের বটফল খাওয়ার কট্‌কট্‌ শব্দ জেগে থাকে, পাতা উড়ে যায় জোর বাতাসে, তখন প্রকৃতির সেই নির্জনতায় তিনি অবগাহন করেন; আবার তেমনিভাবেই তাঁর চেতনায় জেগে থাকে শুকনোপাতা-উড়ে-যাওয়ার শব্দে ভরা নিঃসঙ্গ রাত্রি। বিনোদবিহারী তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন পেয়েছিলেন এই শান্তিনিকেতনের রুক্ষ রূপে এবং সেজন্যই এই চিত্রকরের দৃশ্যচিত্র মুখ্যতঃ নির্জনতার গল্পই বলে।

আমরা দেখতে পাই যে বিনোদবিহারীর প্রথম দিককার শিল্পকর্মে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে এক ধরণের তীব্র অন্তর্মুখীনতা—প্রকৃতির একলা রূপ যাতে প্রাধান্য পেয়েছে, মানুষের ভিড় নেই বললেই চলে। উদাহরণ হিসাবে মনে আসছে তেলরঙে করা **এপ্রিল** (১৯২৮) বা টেম্পেরায় করা **হেমন্তশ্রী** (১৯৩১), **সেতু** (১৯৩২), **ট্রিলাভার**-এর পোট্রেট অথবা **বনভূমি** (১৯৩৮)। এই সব কাজগুলিকে ডুবে থাকে এক আচ্ছন্ন-করা রিক্ততা। টেম্পেরায় কাজ করা **সেতু**-তে কাঁটালতা গুল্মাদির মাঝখানে নড়বড়ে নির্জন সেতু দাঁড়িয়ে থাকে রুদ্ধশ্বাসে—ব্যক্তিগত ট্র্যাজিক মনোভঙ্গী যেন সঞ্চারিত এই সাধারণ অতি পরিচিত সেতুতে। সাধারণ, তুচ্ছ, বাস্তব প্রাত্যহিকতাকে বিনোদবিহারী তুলে ধরেন, দান করেন অনির্বচনীয়তা। এই পর্যায়ের চূড়ান্ত রূপ বোধ হয় মূর্ত হয়েছে **ট্রিলাভার**-এর পোট্রেটে (১৯৩২) আর টেম্পেরার কাজ করা বনভূমিতে। এই শেষোক্ত কাজটিতে নির্জন একাকী গাছ সৃষ্টি করে কী অপূর্বতায় আদিম ঘন অরণ্যের রূপ!

কিন্তু বিনোদবিহারীর চিত্রকর্ম নির্জনতায় কবিতা শোনায় বলতে আমি এই বোঝাচ্ছি না যে তিনি মানবজীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। বরং উল্টো। তাঁর প্রারম্ভিক একমুখীনতা ক্রমশ পরিণতি লাভ করেছিল উৎসুক বহির্মুখীনতায়। তিনি একলা গাছ, নির্জন সেতু থেকে চোখ সরিয়ে তাকালেন মানবজীবনের দিকে, যেখানে তাঁর শিল্পিত চেতনা খুঁজে পেলো উপকরণ। কলা ভবনের ছাত্রাবাসের ছাদে, চীনভবনে এবং হিন্দীভবনের মিউর‍্যাল চিত্র তাঁর সার্থক জীবনবোধেরই পরিচয়বাহী। বস্তুতঃ, নির্জন আখ্যায় কোনো শিল্পীকে আমরা আখ্যাত করি যখন, তখন তার সমগ্র শিল্পকর্মের ভাবটাকে বুঝিয়ে থাকি মাত্র। বিনোদবিহারীর চিত্রকর্মের ভাব ও ভাষা নির্জন এবং বিশেষ। যে-ছবি তিনি আঁকেন তা নিরাভরণ প্রকৃতিই হোক আবার বহুলকর্মব্যাপৃত মানবজীবনই হোক—সবকিছুই খুব একটা অন্যরকম, একটা নতুনরকম ভঙ্গীতে রূপায়িত হয়, যে ভঙ্গী তাঁর আগে আর আমাদের চোখে পড়েনি।

তৎকালীন ভারতীয় চিত্রীদের মধ্যে একমাত্র বিনোদবিহারীই অকুণ্ঠ পদক্ষেপে, নিঃসংশয় বলিষ্ঠতায় চূড়ান্ত গন্তব্যমুখী হয়েছেন। হ্যাঁ, আবারও আমাদের মনে পড়ে যায় "খোয়াই, আর তাতে একটি সলিটারি তালগাছ।" তিনি দিগন্ত দেখতে পেতেন, জানতেন "তাঁর লক্ষ্য—গন্তব্য"। একথা সরল শোনায়। আমরা ভাবতে পারি তাইতো হওয়া উচিত, সেটাইতো স্বাভাবিক, কিন্তু শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে এই আপাতসরল কথার মতো জটিল ও গভীর কথা কমই আছে। আসলে, বিনোদবিহারী ছিলেন একজন intellectual artist—একজন সচেতন শিল্পী, অর্থাৎ তিনি এমন জাতের শিল্পী ছিলেন না যিনি "একান্তই হৃদয়নির্ভর, প্রেরণায় বিশ্বাসী এবং যার হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সতিনসম্বন্ধ।" শিল্প নিয়ে বিনোদবিহারী প্রচুর চিন্তা করেছেন, কেবল অনুভূতির দ্বারা শিল্প উপলব্ধি করেননি,

সচেতন হয়ে চিন্তা করেছেন—তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধেই তাঁর এই শিল্প-জিজ্ঞাসার পরিচয় ছড়িয়ে আছে। জানার আগ্রহ নিয়েই তিনি জাপানে যান, আঙ্গিকের চর্চা করেন নতুনভাবে, পড়েন চৈনিক সৌন্দর্যশাস্ত্র—এর ফলে তাঁর তুলির টান-টোনের বা রঙের ছোপছাপ দেবার রীতি পূর্বের চেয়ে উন্নততর হয়ে উঠেছিল।

বিনোদবিহারীর চিত্রকর্ম চোখ টানে কারণ তা সর্বতোভাবে সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌ম থেকে মুক্ত। তদানীন্তন শিল্পীদের চিত্রকর্মে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত পেলব ভাবালুতা, কিন্তু বিনোদবিহারীর ছবি তার থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, অন্য স্বাদ বহন করে এনেছিল—যদিও তিনি গড়ে উঠেছিলেন তথাকথিত "বেঙ্গল স্কুলের" শিল্পীদের সঙ্গেই। প্রথম কথা, তিনি কোনোদিনও "রোমাণ্টিক" ছবি বা পৌরাণিক ছবি করেন নি—কেবল অবনীন্দ্রনাথের শাজাহানের মৃত্যু-র অনুকরণে করেছিলেন থামওয়ালা বারান্দা, যাকে তাঁর সমগ্র শিল্পীজীবনের ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। এই ছবি করার পর প্রচুর প্রশংসা পান তিনি, ছবিটি বিক্রি করে কিছু টাকাও হস্তগত হয়, কিন্তু পৌরাণিক চিত্র তাঁর স্বভাবে ছিল না। রূপক চিত্রও তাঁর মনকে নাড়া দিতে পারেনি। চিরদিন তিনি ছিলেন মাটির কাছাকাছি। বাস্তব জীবন, প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ—এসবই বিনোদবিহারীর ছবির বিষয়বস্তু। তাঁর মিউর‍্যালের বিষয়বস্তুও মানুষ—সবই "দেখা জিনিস, জানা জিনিস……নিজের চোখে দেখা সাধারণ ব্যাপার।" তিনি তো বলেইছেন "ওসব অ্যাবস্ট্রাকশনের যান্ত্রিক ব্যাপারে আমার কোনো ইণ্টারেস্ট নেই।" দ্বিতীয়তঃ তাঁর ধ্রুপদী চিত্রকর্ম বাহুল্যবর্জিত—কোনো গাণিতিক সমীকরণের মতো, স্থিতি আসে "as final as a Q E D.।" তাঁকে যারা ছবি আঁকতে দেখেছেন, তারা বলেন যে তিনি আঁকতে আরম্ভ করেন আশ্চর্য abstraction-এ; এখানে একটু উষ্ণ ছোপ, একটু নীল, ওখানে হলুদ—যেন কোনো দাবা খেলোয়াড় চাল গুণে গুণে অমোঘ পরিণতিতে অগ্রসর হচ্ছেন। রূপের গড়ন ছিল তাঁর সৃষ্টির বিষয়। দৃঢ় অথচ সলীল রেখা উঠে যায়, ইস্পাতের মতো ধারালো তাদের গতি। রেখার গতিতে নেই কোনো দ্বিধা, কোনো আড়ষ্টতা—যে-সব ছবি সৃষ্টি হয়েছে তারা রেখার বাঁধনে স্থির অথচ গতিহীন নয়। হেমন্তশ্রী-তে আমরা দেখি কাশের গুচ্ছ উঠে আসে কি সতেজতায়, যেন গতির মুখে মন্ত্রস্তব্ধ, হাত দিলেই দুলে উঠবে। অথচ কি স্বল্প বর্ণবিলেপনেই তিনি এইসব ফল লাভ করেন! বর্ণ সমারোহ তাঁর চিত্রে প্রায় নেই বললেই চলে। অন্যদিকে কি অসাধারণ নাটকীয় সরসপ্তারে দক্ষ এই চিত্রকর, সাধারণ বিষয়বস্তুও ব্যক্তিত্বের রসে জারিত হ'য়ে লাভ করে স্বকীয়তা। গাছ, ফুল, ঘাস—এমনকি পায়ে-চলা পথ, নিত্যব্যবহার্য অতি সাধারণ জিনিসপত্রও প্রাণ পায় তাঁর হাতে, তাপ বেরিয়ে আসে তাদের শরীর থেকে, স্রষ্টার কাছ থেকেই ধার করে বুঝি তাঁর প্রাণশক্তি।

যে সময়ে বেশীরভাগ ভারতীয় চিত্রী য়ুরোপীয় ধারায় ছবি আঁকতেন, সে সময়ে তিনি নিজস্ব Calligraphic টানে Tonal Variation সৃষ্টি ক'রে ল্যাণ্ডস্কেপচর্চার এক নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছিলেন। ইজেল বা মিনিয়েচার পেণ্টিংএই ছিল সকলের আগ্রহ, কিন্তু বিনোদবিহারী স্ক্রীন, স্ক্রোল এবং মিউর‍্যালের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন, যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। তিনি চিরকালই একনিষ্ঠ ভাবে ভারতীয় শিল্পঐতিহ্যে মনোযোগী ছিলেন এবং চৈনিক ও জাপানী শিল্প আঙ্গিকচর্চার মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিল্পধারাটিকেই সজীব করতে প্রয়াস পাচ্ছিলেন। যদিও পাশ্চাত্য প্রভাব ছিল তাঁর আঙ্গিকে, তবুও কখনোই তাঁর ছবিগুলি অ-ভারতীয় হ'য়ে ওঠেনি। ক্রামরীশ বলেছেন: "Their [বিনোদবিহারীর চিত্রকর্মের] Indianness is not conveyed by their subjects Sunflowers or sweet peas as he paints or draws them have their own, intimate life; they are not Indian flowers but Indian pictures have been made of them". এই তো যথার্থ শিল্পী! শিল্পে গভীর একাত্মতা আবার একই সঙ্গে তা থেকে ঊর্ধ্বে ওঠার, বিচ্ছিন্ন থাকার ক্ষমতা—এই তো শিল্পীর লক্ষণ। বিনোদবিহারীর সময়ে তাঁর মতো স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সচেতন শিল্পী আর কেউ ছিলেন না।

কিন্তু, এইরকম প্রতিভাশালী চিত্রকর বিনোদবিহারী ১৯৫৬ সালে এক অবিবেচক চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারে আলোর জগতে তাঁর প্রবেশ হারালেন। আর এখানেও, আরো একবার আমাদের মনোযোগ ধ'রে রাখেন এই দৃষ্টিহীন চিত্রকর। আমাদের জানতে ইচ্ছে হয় সতত সৃষ্টিশীল এই শিল্পী কিভাবে এই অন্ধত্বকে গ্রহণ করেছিলেন ; এই দারুণ বিপর্যয়ে কি বিহ্বল হ'য়ে পড়ে—ছিলেন তিনি ? জীবনাবসানের কথা ভেবেছিলেন কি ? কারণ, অন্ধত্ব তো চিত্রকরের পক্ষে একপ্রকার মৃত্যুই ! যদিও বিনোদবিহারী তাঁর দৃষ্টির ক্ষীণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তবুও এই দৃশ্যময় পৃথিবী থেকে নির্বাসন তাঁর সহ্য হ'য়েছিল ?

হ্যাঁ, তিনি তাঁর অন্ধত্বকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন কিন্তু বিজিত হননি তার দ্বারা। অন্ধকারকে আলোয় ভ'রে দিতে পেরেছিলেন তিনি। চোখে কালো চশমা পরে কুড়ি বছরেরও অধিক কাল তিনি বেঁচেছিলেন শিল্পী হ'য়েই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি lithograph, কাঠখোদাই, কোলাজ ইত্যাদি কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। এছাড়া ১৯৬৯-৭০ সালে দৃষ্টিশক্তি রহিত অবস্থায় বড়ো একটি মিউরাল হাতে নেন বিনোদবিহারী—কলা ভবনের ফ্যুডিওর দেওয়ালে রং করেন রঙিন টালিতে। তাঁর জীবনের এই শেষ বড়ো কাজের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে ছিলেন এমন একজন শিল্পী শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ বলেছেন : "বারবার মনে হয়েছে তিনি প্রকৃত অর্থে বোধ করি দৃষ্টিহীন নন। হাত বুলিয়ে খসড়া কাগজের জমির উপর কাটা কাগজ দিয়ে দৃশ্যবস্তু তৈরী করার সময় যে পরিমিতি বোধ, বস্তুর গড়নের সরলীকরণ, সেই সঙ্গে সঠিক ছন্দ দাঁড় করাতেন তা আমার কাছে আজও বিস্ময়। অভিজ্ঞতার স্মৃতিচিত্র তাঁর মানসচক্ষে তখনও এত সজীব হ'য়ে কাজ করছে যা চক্ষুষ্মান পরিণত শিল্পীর পক্ষেও অসম্ভব।"

আমাদের ভাবতে অবাক লাগে কেমন ক'রে এই অন্ধকার তিনি জয় করলেন! "আলোর জগতে অন্ধকারের প্রতিনিধি" হ'য়েও তিনি গুহার ভেতরে নিবাত দীপশিখার মতো স্থির ছিলেন কি অসীম মনোবলে! অন্ধের জগৎ তো এক বর্ণহীন কোলাহল মাত্র, যেখানে স্পর্শ ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়। তিনি নিজে বলেছেন, "অন্ধত্ব ব্যাপারটা আসলে খুবই complex...space সম্পর্কে একটা নতুন চেতনা হয়। spaceটা হ'য়ে যায় একটা ঘন বস্তু—সেটাকে হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে সামনে এগোতে হয়। যে জিনিষটা স্পর্শ করছি সেটা ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্বই থাকে না। তোমরা চেয়ার দেখলেই বুঝতে পারছ সেটা আছে, আমি চেয়ারে বসলে পরে তবে বুঝছি সেটা আছে। .....অপ্রত্যাশিত কিছু হাতে ঠেকলে চমকে উঠতে হয়। এই যে চেয়ারে ব'সে আছি, লাঠিটা আমার সামনে হাতলের উপর আড়ভাবে রাখা আছে—যদি লাঠিটার কথা ভুলে যাই, তাহলে সেটা হাতে ঠেকলেই শিউরে উঠি। এছাড়া আবার আরেকটা দিক-ও আছে। এই যে চায়ের গেলাসটা হাতে নিলুম-কাঁচ জিনিষটার স্পর্শগত অনুভূতি কোনো দিন আগে এভাবে feel করিনি। এরকম সব বস্তু সম্পর্কেই একটা tactile feeling গড়ে ওঠে।..... আঁকছি, আঁকছি, কেউ হয়তো হঠাৎ দেখে বলল—'ওকি আপনার কাগজে যে দাগ পড়ছে না'।" যখন কোলাজ করতে গেছেন তখনও অনুভব করেছেন বারবার এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা—"অমুক জিনিসের মতো নীল, অমুক ফুলের মতো লাল—এই রকম ব'লে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতেও প্রিসিশন সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত একটা সংশয় থেকে যায়।" তার স্রষ্টাহৃদয়ের গভীর হতাশা থেকে উঠে আসে প্রতিধ্বনি কত্তামশাই আর চাটুজ্জের কথোপকথনে :

—"আচ্ছা তোমার আকাশে তারা নেই ?

—না আমার আকাশে কোনো তারা নেই। সে আকাশ গাঢ় অন্ধকার।

—খুঁজে দেখ, হয়তো একদিন ধ্রুবতারার সন্ধান পাবে তোমার ঐ আকাশে।"

হ্যাঁ, সেই ধ্রুবতারাই ফুটে উঠেছিল তাঁর কঠিন কালো আকাশে। তাঁর আত্মবিশ্বাস, তাঁর মানসিক শক্তি, তাঁর অফুরন্ত সৃষ্টির তাগিদ সেই আলো ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল। অন্ধকারের মধ্যে তিনি শুনলেন আকারের ঝংকার। বর্তমানের প্রতি বিস্মৃত হ'য়ে নিরেট অন্ধকারের

মধ্যে গভীরতার আস্বাদ পেলেন, যেহেতু তিনি বুঝলেন যে চরম দুঃখের সান্ত্বনা নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। উচ্চারণ করলেন, "অন্ধকার তো আমার জগতের আলো।" বস্তুতঃ, বিনোদবিহারী প্রকৃত শিল্পী, তাই তিনি ফুরিয়ে যাননি। অন্ধ হয়েও দৃষ্টিমান ছিলেন তিনি আমৃত্যু —তাঁর অন্তর্দৃষ্টি তো চিরস্বচ্ছই ছিল। প্রকৃত শিল্পীদের ভেতর বোধহয় দধীচির হাড়ে গড়া, বজ্রের মতো প্রতিহত শক্তি। তাই বিনোদবিহারী পাথরে ফুল ফোটাতে পেরেছিলেন; অন্ধত্বকে একটা মানসিকতা হিসাবে দেখেছিলেন —একটা অবস্থা যা একেবারে দুরতিক্রমণীয় নয়।

যখনই বিনোদবিহারীর চিত্রল সান্নিধ্যে আসি তখনই মনে হয় এক অ-সাধারণত্বের মুখোমুখি আমি—আর ছবিগুলো থেকে উঠে আসে সেই প্রবল, নির্জন, একলা ব্যক্তিত্ব, যাঁর অন্তর্দৃষ্টি এমনই জোরালো, এতো তীব্র যে দৃষ্টিহীনতা শব্দটা অবান্তর হ'য়ে যায়। শ্রদ্ধায় ভ'রে আসে মন। এসব মানুষের জাত আলাদা। এঁরা সব "তিনতলার বাসিন্দা"; এঁরাই আলো জ্বালেন, শঙ্খধ্বনি করেন মোড় ফেরাবার সময় এসেছে বলে। চোখে ভাসে রুক্ষ পাথুরে জমি আর তার ওপরে গাঢ় সবুজ পাতা মেলা লম্বা একলা তালগাছ।

ফসল

বিদিশা ঘোষ দস্তিদার

এটা আশ্বিন। বাতাসে আসন্ন শীতের হাল্কা আমেজ। আকাশে নীল্‌চে ছাই রঙ ধরেছে। পুজো ঘরের দরজায়।

এখানে কাশফুল ফোটে না, হলদে-সাদা বালিয়াড়ির মাঝে মাঝে বুনো গাছের জটলা, কয়েকটা তাল খেজুর।

ছিটে বেড়ার ঘরে তেলচিটে পুঁটুলী মাথায় সনাতন পাশ ফিরলে, ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে আকাশের আভাটুকু, আর আঁধার নেই। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে বাসরাস্তার ধারে কেষ্টর দোকান এতক্ষণে হয়ত সরগরম হয়ে উঠেছে। উঠে দাঁড়ায় সনাতন, আড়মোড়া ভেঙে বাইরে বেরোয় — আ-হ্ শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। "ই শালোর ঠাণ্ডি কুতখন্ বা টি'ইকবেক?" নিজমনেই বলে সে, তারপর চলতে শুরু করে।

সনাতনের বয়স পনেরো। মা-বাপ-ভাই-বোনের সাথে থাকে ঝোপড়িতে। বাপ ভাগচাষী, সনাতন নিজেও কাজ করে ক্ষেতে, মা চাটাই বোনে, জালি পেতে মাছ ধরে, জ্বালন কুড়ায়, রাঁধে বাড়ে, আর বাপ হাঁড়িয়া টেনে ফিরলে, কাঁদে পা ছড়িয়ে, বলে—"এমুন মরদের হাতে পড়ো হাড়-মাস ভাজা ভাজা হই গেলক গ'।"

এ বছর চাষ হয় নি। প্রচণ্ড খরায় জ্বলছে সারা দেশ। বাঁকুড়ার এই অঞ্চলে ক্ষেত-খামার শুকনো ফুটিফাটা, দূরের দিকে চাইলে চোখ জ্বালা করে। ঘরে খাবার নেই, জমিতে কাজ নেই। সনাতন তাই কেষ্টর দোকানে পেট ভাতায় কাজ করতে যায় আজ ক'দিন। ও শুনেছে পঞ্চায়েত আর বি. ডি. ও. অপিসের বাবুরা নাকি খাবার দিয়ে কাজ করাবে, তখন কষ্ট কিছুটা কমবে হয়তো, কিন্তু এখনো তেমন কিছু চোখে পড়ে নি।

দোকানে ঢুকতেই কেষ্ট ধমকে ওঠে "এ্যাঃ, লবাবের পুত এত্‌খনে আইছেন, তিনটা কেট্‌লী চা হল্যেক্, দুধ গরম হল্যেক, উয়ার লাকডোগাটি দেখ্যা গেল্যেক নাই। যা যা কাজ করগা, খাবেক ডল্যে মুচড়ো, কাজের বেলা টুঁ টুঁ বটো, শুদ্দা ছোটলোকটি"।— সনাতনের বুকের ভেতর একটা অসহায় রাগ দলা পাকিয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে থুথু গেলে সে, তারপর এগিয়ে যায় ভেতর দিকে।

এখানে চা খায় ট্রাক ড্রাইভার আর স্টেশনের পেশাদার ভিক্ষুক, কখনো সখনো গাঁ দেখতে আসা বাবুরাও। এখন প্রায়ই ফটক তোলা যন্তর হাতে শহুরে

বাবুরা ক্ষেতি জমির ফটক তুলে নিয়ে যায়। কেষ্ট হাসি-হাসি মুখ করে তাদের সাথে ভাব জমাতে চেষ্টা করে, পরে বিজ্ঞের মত সবাইকে বলে—"খপরের কাগজে ছবি ছাপাই হব্যেক বটে। কইলকেতাকে তো চাইষবাড়ী লাই, বাবুরা অগত্যা ফটকই দেইখবেক।"

ভারী অবাক হয় সনাতন, "কইলকেতা বটে আজবটি, চাইষবাড়ী লাই, ঘাস পাতাটিও লাই, তবে সিখানকে মনিষ্যি থাইকবেক কেমুন করো, ভগমান জানে"।

দোকানে কাজ রয়েছে বিস্তর। বাসন মাজা, কাপ-ডিস ধোয়া, খদ্দেরকে চা, পাঁউরুটি, ডিম বিস্কুট পৌঁছে দেওয়া, সবই করে সনাতন, এরই মাঝে এক ফাঁকে দুপুরের ভাত তরকারী করে নেয়। দুপুরের দিকে ভিড় পাতলা হয়ে আসে, লোক প্রায় থাকে না। বিশাল হাঁ-মুখ উনোন দুটো জ্বলে জ্বলে নিভে যায়। ভাত খেয়ে বেনচে শুয়ে নাক ডাকায় কেষ্ট। আর এ সময়টা সনাতনের বড় কষ্টে কাটে।

যতদূর চোখ যায় শুকনো মরা ক্ষেত, তার ওপর হু হু বাতাস ধুলো উড়িয়ে ফেরে, শুকনো বাঁশপাতা ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে যায় আবার নেবে আসে। সেদিকে তাকিয়ে সনাতন ভাবে "মা আজ কি খেলোক কে জানে, বোষ্টুমদের ঘর চিঁড়া কুটে দুটিখানি কাল পেইছিল, ভাই-বোন দুটা তো তাই খেয়েই রইলেক আজ বা কি হয়"। ছেলেবেলার কথা বড় মনে আসে —"বাপরে ঝেখন ল্যাংটা উদোমটি, তেখন ইশ্‌কুলকে যাবার বড় ইচ্ছা ছিল। তা বাপটো গরীব গুরবো, পড়্যাতে লাইরলেক, বাসনাটি সফল হল্যেক নাই। এখুন মিনি পইসার ইশকুল হইছে, সেথাকে লাল লীল বই দেয়, দুকুর বেল্যা টিপিন দেয়, ভাই গণেশ বড় ভাগ্যিমন্ত, সকালে বই লিয়ে ইশকুল যায়, সন্‌ঝায় পড়্যে টেমির আলোয়। এই খরার জ্বালায় ম্যাষ্টর সব পলাই যেইছে শহরকে, ইশকুল তাই বন্ধ বটোক"।

দোকানের কাজ সনাতনের ভাল্যো লাগে না, চায়ের গন্ধ, লোকের ভন্‌ভনানি অসহ্য ঠেকে। তার সমগ্র চেতনা উৎসুক হয়ে থাকে পাকা ফসলের আঘ্রাণ নিতে, মাটি ফুঁড়ে বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমে, তার প্রতি রক্তকণা হয় মুকুলিত। এ সময়টা তার কাছে তাই বড় বেদনার।

ক্রমে বিকেল হয়ে আসে, আবার উনোনে আঁচ পড়ে, ঘুম ভেঙ্গে কেষ্ট ওঠে। তবে ঐ বেলায় বেশী লোক থাকে না, খাটুনি কিছুটা কম। তবু ছাড়া পেতে পেতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যায়।

আকাশে পাণ্ডুর জ্যোৎস্না। দোকানের ঝাঁপ ফেলে কেষ্ট, আগামীকালের উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সনাতনকে। সনাতন বাড়ীর পথ ধরে।

হন্‌হনিয়ে পথ হাঁটে সনাতন। চাঁদের শীর্ণ আলোয় আলপথ পরিষ্কার। হঠাৎ কেমন আঁধার হয় মাঠ। সনাতন আকাশে তাকায়, তার সমগ্র সত্তায় যেন ঝড় ওঠে। এক টুকরো কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। আকাশের গায়ে পরতে পরতে মেঘ।

মেঘ-জল-ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, মাটি ফুঁড়ে ওঠা সবুজ ধানের গুছি, মঞ্জরীর সুবাস আনন্দে তার শরীর রিমঝিমিয়ে ওঠে, প্রায় দৌড়তে শুরু করে সে। কেষ্টর চোখরাঙানি নেই, নেই কয়লার নোংরা ধোঁয়া, গণেশের পড়া আবার চলবে, বাপ হাঁড়িয়া খেয়ে মাতাল হবে। হেই মা বসুমতী—সন্তানের হাত ভরে ফসল দিও মা। সনাতনের দু' চোখ ভরে শুধু সবুজ। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধার মত বলিচিহ্নিত মাঠ আবার হেসে উঠবে শ্যামল তারুণ্যে। সনাতন দাঁড়িয়ে যায়। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা অঝোরে ঝরে যায় সেই খরাক্লিষ্ট মাঠে। সনাতনের সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে জলের ধারা ছুটে চলে মাটির দিকে। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে সনাতন তৃষ্ণার্ত মাঠের মতই জল শোষণ করে নিতে থাকে।

হাসপাতাল

শঙ্খ ঘোষ

রোজ আসতে আসতে সবারই সঙ্গে জানাশোনা হয়ে যায় একদিন
সবার দিকে তাকিয়ে বলা যায় : এই-যে, কেমন—
গ্রহণের সূর্যের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় বেশ সহজে

গ্রহণের সূর্যের দিকে তাকানো যায় সহজে
কোনো অপরাধের কথা কোনো ক্ষতির কথা মনে থাকে না আর
আমারও আজ ইচ্ছে করে এমন সব কথা বলি যার কোনো মানে নেই

আমারও ইচ্ছে করে এমনসব বলি যার কোনো মানে নেই
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা একটাই মাত্র স্তূপের মতন ঊর্ধ্বতায়
মুহূর্তের বল্মীকে ভরে থাকে যার অগোচর ধ্যান

মুহূর্তের বল্মীকে ভরে থাকে যার ধ্যান
তার ভিতর থেকে তাকিয়ে দেখা যায় জায়মান অশথের পাতাগুলি, শুধু
আমাদের মাঝখানে জেগে থাকে পুরোনো এক হালকা পর্দা

আমাদের মাঝখানে একটাই সেই পর্দা এখনো স্থির
সীমান্তের কাছ থেকে জলতরঙ্গের শব্দ শুনে শুনে
চৌকাঠ পেরিয়ে গহ্বরের দিকে পা বাড়াই, ফিরে আসি

চৌকাঠ পেরিয়ে গহ্বরের দিকে ফিরে আসি, আর
পথচলতি চিৎকারের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে মনে পড়ে
দেখে এসেছি ক্যান্সার হাসপাতালে সকলেই আজ বেশ হাসিখুশি।

ছুটি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ছুটি হয়ে গেছে, তার কোনো কাজ নেই
বাকি।
জীবনে জোনাকি
একমাত্র দেয় আলো।
তবু ভালো,
একটু আলোর ছোঁয়া আছে অন্ধকারে।

ঘরের বাহিরে এসে দাঁড়ালে দেয়ালে
দৃষ্টি যায় ঠেকে।
সমস্ত সহজ পথ গেছে এঁকেবেঁকে—
যাক।
অনেক সহজ বাঁকা পথে ও হেঁটেছে
রোজ।
আজ তার খোঁজ
নেবার মতন নেই লোক।
হোক, বহুকাল পরে একা থাকা হোক—
ভালো।
বেশি-না কম-না এই জোনাকির আলো,
ছুটি হয়ে গেছে, তার কোনো কাজ নেই ॥

১৩.১.৮৪

যাপনগুচ্ছ

সুতপা সেনগুপ্ত

১.

হায় কী মজার খেলা আমি সারা জীবন ধরে খেলছি,
প্রথমে আগুন ভেবে ছুটে আসে পতঙ্গেরা, তারপর পতঙ্গ ভেবে
ছুঁড়ে দেয় আগুন

২.

হে ফুল, তুমি দেবতার পায়ে পড়বার জন্য জন্ম নিয়েছো
কোনোদিন কি ভেবে দেখেছো, যোগ্য পা মিলবে কিনা

৩.

শরীর যখন সঙ্গ দেয় আরেক শরীরকে
আমরা মিথ্যেই কষ্ট পাচ্ছি মন আর মাংসকে মেলাবার জন্য

৪.

তারা প্রত্যেকেই আমাকে দেখিয়েছিল একটা পৃথিবীর মতো থালা
তারপর নিয়ে এল একটা থালার মতো পৃথিবী

৫.

ঝরা পাতার মধ্যেই সারা জীবন শুয়ে আছি
কখনোসখনো কেউ এসে জাগিয়ে দিচ্ছে পাতা জ্বালার জন্য

৬.

আসবাবের মতো শৌখিন নই, রুটির মতো অপরিহার্য ;
আমি একটি রমণী, যার কাঁটা ও গন্ধ দুইই সমান

৭.

ফ্ল্যাট বাড়ির নিস্তব্ধতার মতো জেগে আছি, মাথা আকাশে উঁচু
কিন্তু বারবার নুয়ে পড়তে চায় বাইরের অন্ধকারের সাথে

৮.

মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে আছি
সন্ধে নামছে বাইরে
অল্প অল্প টান দিচ্ছি তুলিতে আর
হয়ে উঠছে তোমার বিরহে আমার মূর্তি

খিন্নভিন্ন

সুদীপ্ত সেনগুপ্ত

তিস্তার সঙ্গমপ্রত্যাশী রঙ্গিতে
আলগোছে ভাসানো পাতা দুটি
তোমার চাকভাঙা সৌরভ
আসন্ন মৌতাতে
তোমারই আবর্তে আছে জমে

অথচ মুখখানি পাথরেতে লেখা
সময় এঁকে গেছে জলে জলে রেখা

স্বপ্ন ?
স্বপ্নেও জমে কিছু খেদ
আমাতে রেখো না এই ভেদাভেদ

এই সব ব্যর্থ কথা

সুব্রত সেন

মৃতদেহ চুপ করে থাকে।
যেমন স্তব্ধ থাকে অণু পরমাণু
দেহের অন্তমূলে অরণ্য গভীরে
মহাকাল চুপ করে থাকে।
সোনালী দুপুরপ্লাবী মেহগনি রোদে
বেশবাস খুলে রাখে শেষ কৈশোর
আনগ্ন হেঁটে গ্যাছে কস্তুরীঘ্রাণে।
চরাচর চুপ করে থাকে
যেমন স্তব্ধ থাকে ঋজু বৃক্ষ, ঘাস
অমোঘ ছন্নছাড়া জিরাফ দম্পতি.....

সব কিছু চুপ করে থাকে
অথচ ব্যক্তিগত শব্দকাম মোহে
এই সব ব্যর্থ কথা, কবিতাটবিতা।

প্রবাস

প্রগতি চট্টোপাধ্যায়

ঘরের পাশে একটি গভীর নদী
অচেনা মেয়ে, চোখের পাতা কাঁপছে

জান্‌লাটি বেশ, ফরাসী চেহারা তার
মাঝে মাঝে টিয়েরঙ ছাড়া থাকে, দূরে উচ্চাবচ
টিলাদের ঘন ভীড়, একটা দূরবীন থাকলে ভাল হোত।
দেহাতী মানুষ হাঁটছে, লাল গামছাটা বেশ
টুকি দিয়ে গেল তোতোনের লাল বল
যেমন গড়িয়ে গ্যাছে প্রপাতের দিকে।

সকলের দূরবীণ থাকেনা,
আমি নদীটির দিকে তাকিয়ে আছি.....

মনে করো বহুদিন পরে আজ

অভিজিৎ লাহিড়ী

মনে করো বহুদিন পরে আজ কোথাও চলেছি, লক্ষ্যহীন চলেছি ভ্রমণে দেশ-দিক্‌হারা। মনে করো, যেন আজ আমাদের কোনো কাজ, কোন তাড়া নেই ; সকালবেলার ছুটি সারা গায়ে—পথের রৌদ্রের স্নান অদ্ভুত মসৃণ। কোথাও দেয়াল নেই, মেঘ নেই ; মনে করো যেন চরাচর নুয়ে আছে সবুজের মুগ্ধ ঋতুভারে। ফসলের গন্ধ বহে যায়। মনে করো, এমন বসন্তে কোনোদিন কোথাও চলেছি...

পড়েনা, পড়েনা মনে ?

তবে কি আমারই হোলো ভুল ? আমার মোহের ঘোরে স্মৃতি হোলো এতোই ঘাতক—অবিশ্বাসী ছুরি ! কোনোকালে খোলেনি দরোজা, দেওয়ালের গাঢ় প্রতিরোধ অবিরত আড়াল এনেছে স্মৃতি-হীন ! তবে-যে অনেক ঘুমে চাঁদের ছোঁয়ায় লেগে তোলপাড় হোয়ে গ্যাছে জল—অরণ্য কেঁপেছে সারারাত কামনার মতো—তোমার ঠোঁটের নুন শুষেছে প্রণয়, মানুষের ছদ্মবেশে এসে—তবে কি আমারই হোলো ভুল ?! জান্‌লার ছোট দেখাশোনা, মৃদু-মন্দ অল্প জীবন—এই নিয়ে এতোদিন এতোদীর্ঘ ভালোবাসা হোলো ? কোনো-দিন কোথাও যাইনি !

তাই যদি, কী ক্ষতি ? কতটুকু ক্ষতি ?

দাঁড়িয়ে রয়েছি আজো অনন্ত বিস্ময়ের দিকে পথের উপরে। নিজেকে বলার এই সুসময়, নিজেকে জানার আরো ভালো। এখনই এগোবে বোলে নিজেকে বলেছি, তবে চলো। আমাদের খোলা হোক্ পথের প্রবাহ এবং যা কিছু কথা পড়ে থাক্ কবিতার ছদ্মনামে প্রাচীন হলুদ মাখা এই প্যাপিরাসে।

বাইরে হাওয়ার হিম—শীতের সঞ্চয় নামে ঘাসে। মানুষ ঘুমিয়ে আছে, কাউকে ডেকোনা। আজ আর কারো ছুটি নেই ; ছুটি শুধু আমাদের চুরি করা অভ্যাসের কাছে। মনে করো, বহুদিন পরে আজ কোথাও চলেছি—ভ্রমণের গতিছন্দে বাঁধা খুলে যায় দুয়ার পরিধি—যে রকম খুলে পড়ে আঁধার দেওয়াল ভোরবেলা—মনে করো এমন বসন্তে কোন দিন কোথাও চলেছি—কেউ নয়, শুধু দুই জন, প্রতিবিম্বের মতো পাশাপাশি যেতে-যেতে আবরণহীন গ্রামের কিনারে

স্মৃতিরা

ভাস্বতী চক্রবর্তী

নদীরা এখানে থাক শীতের রোদ্দুরে
পিঠ দিয়ে
নরম ত্বকের নিচে জমে থাকা সময়ের হিম
অবসিত হলে ফের সন্ধ্যামণি ফুলের বাগানে
ফিরে যাবে।

সকলেই ফেরে
ছড়ানো ফেনার ফুলে লিখে রেখে
নিজেদের নাম
অন্ধকারে উড়ে যায় পরিত্যক্ত আপন কোটরে
কেউ বলে প্রেম, কেউ বলে না
প্রেমের খাঁটি সোনা

তবুও আঁচল ভরে সন্ধ্যামণি ফুল কেউ তোলে
বুকের গভীরে এক নদী থাকে
অঞ্জলিতে ধরা ভোরের আলোর মত—
অফুরাণ জলের ফোয়ারা

তারপর সন্ধ্যা হলে সকলেই ঘরে ফিরে যায়

বিবর্ণ কাঁথার নক্সা সেঁকে নেয় নোতুন রোদ্দুরে!

জীবনকে খুঁজেছিল তাই

অভিজিৎ দত্ত

জীবনকে খুঁজেছিল তাই
এইসব ব্যর্থ খোঁড়াখুঁড়ি
উঠোনেতে ঝরিয়েছে কুঁড়ি
ঘুম কাড়া তবলা সানাই

সকাল ফুটেছে মিহি রোদে
দিয়ে যায় স্বর্গেরই খোঁজ
যদিও বুকের অবরোধে
পুড়েছিল পুরনো কাগজ

ওড়া পাতা উপেক্ষিত শীতে
জড়ো হয় নগ্ন সরণিতে
সুর কেটে অন্বিষ্ট সেতারে
হে সময় ডেকে নাও তারে

কোথায়, লাবণ্য, কোথায় ?

দেবব্রত লাহিড়ী

এক একটা দৃশ্য আছে, গোটা শৈশব উঠে আসে
বৌবাজারের এঁদো গলিতে কাঁচা আম বিক্রি দেখে
খুব পরিচিত একটা ঘ্রাণ আজও সুখস্মৃতি আনে
দুপুররৌদ্রে স্কুল পালিয়ে আমবাগান, জামবাগান
হাফপ্যান্টের পকেটে বাড়ি থেকে লুকিয়ে আনা নুন,
আম্রকুঞ্জের গ্রাম্য শান্তি
সহপাঠীর সঙ্গে ভাগ নিয়ে ঝগড়া-সমঝোতা
বাড়িতে জানাজানির ভয়, ইস্কুলে বেতের লকলক—
আজও বহুদূর থেকে আমার নাম ধরে ডাকে।

এসব কি কখনও তলিয়ে দেখেছ, লাবণ্য ?
আমাদের ত্বকে নয়
শিরায় শিরায়, অভ্যন্তর থেকে আরও অভ্যন্তরে কঠিন অসুখ করেছে
বিগত দিনগুলোয় কখনও রাত্রির আকাশ দেখেছ ?
বিশ্বাস করতে পার সন্ধ্যামালতীর গন্ধে এখনও কোথাও কোথাও
চাঁদনীরাতকে বড় সুন্দর দেখায়
সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর বিদ্যুৎসম্পর্ক-ছিন্ন
ভাড়াবাড়ির শীর্ণবারান্দায় যখন চিৎ হতে হয়
তখন, স্বীকার করি, মাথার উপর উপুড় হওয়া একচিলতে আকাশকে
বড় বিষণ্ণ, বড় অর্থহীন মনে হয়।

যা একদিন কল্পতরু ছিল
এইভাবেই একদিন শ্রীহীন, রিক্ত হয়ে গেল।

বোধহয় এইরকমই হয়,
এত কিছুই নয়, দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাওয়া
পুরোনো, অতি প্রিয় ভালোলাগার ভিত
ঝুরঝুর করে ঘুনলাগা ইমারতের মতো ঝরে যাওয়া
আর মাঝে মাঝে ক্লিন্ন অন্ধকারে ভুল করে পিছনে চাওয়া।

ভয় হয়, যার বাসনায় সারাজীবন আমাদের হন্যে হয়ে ঘোরা
যার আশায় জীবনভোর আমাদের এই কঠিন বনবাস
আমরা তাকে পিছনে ফেলে আসিনি তো ?

সেই শিল্পী
ও এক কবির হ'য়ে-ওঠা

সোমক রায়চৌধুরী

অবশেষে পারীতে এসে পড়তে হ'ল তাকে। মাত্র ছাব্বিশটা রঙীন বৈচিত্র্যে-ভরা বছর তার পেছনে। জন্ম প্রাগে, তারপর মিউনিখ, বার্লিনে পড়াশুনো, তারপর অনেক বছর কেটেছে রুশদেশে রুশভাষা অধ্যয়নে আর নীটশের জটিল ধর্মতত্ত্বে। গোটা তিনেক কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছে—তবু যেন স্থায়ী কোনও কর্ম-কাণ্ডের খোঁজ পাচ্ছিল না সেই অস্ট্রিয় যুবক।

পারীতে সে এসেছে রদ্যাঁর কাছে। রদ্যাঁর ওপর—তাঁর জীবন, শিল্পকর্ম, ব্যক্তিত্বের ওপর একটি বই লেখার ভার দিয়েছেন বিখ্যাত প্রকাশক রিশার্ড মুথার—সেই সূত্রে। এই ফরাসী ভাস্করের সৃষ্টিতে যেভাবে জীবন আর শিল্পকে একাত্মভাবে রচনা করা হয়েছে—তা শুনেছে সে বহুদিন তার স্ত্রীর কাছে। ক্লারা ভেস্টহফ রদ্যাঁর ছাত্রী ছিলেন—এখন এই যুবকের সহধর্মিণী। অগুস্ত রদ্যাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার এই সুযোগ তাই সে হাতছাড়া করেনি।

পারী ভালো লাগেনি তার। বড্ড নির্বিকার, প্রেমহীন, দুঃখময় শহর—স্ত্রীর কাছে প্রায়-প্রাত্যহিক পত্রমালায় ছড়িয়ে আছে সে-অসন্তোষের বর্ণনা। তবে চিঠিগুলোর সর্বাঙ্গ জুড়ে আছে যা—তা হ'ল রদ্যাঁর প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা আর মুগ্ধতা। একমাত্র ইনিই পারেন তার স্বপ্নের ভবিষ্যৎকে রূপ দিতে। শিল্প-সাধনা আর নিছক বেঁচে থাকার যে জীবন—এই দুয়ের সম্বন্ধ-বিরোধ নিয়ে যে-প্রশ্ন আশৈশব তার সত্তার বিষকণ্টক—বোধহয় একমাত্র ইনিই পারেন সে জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে।

খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে সে রদ্যাঁকে—১৯০২ থেকে ১৯০৬ : এই চার বছর। তাঁর সৃষ্টি তিলে তিলে রূপ পেয়েছে তার চোখের সামনে। তাঁর চিন্তা ভাবনা অণু থেকে রূপান্তরিত হয়েছে বাস্তবে। আশ্চর্য মানুষ এই রদ্যাঁ। অতল তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর সাহিত্যপ্রীতি, তাঁর চরিত্রের কাব্যময়তা; গভীর তাঁর শিল্পের প্রতি আনুগত্য। "ভাস্কর্য হচ্ছে প্রস্তরীভূত সঙ্গীত"—ফন শিলার বলেছিলেন। আর রদ্যাঁর বালজাক সিরিজের সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে কে যেন বলেছিলেন—এই প্রথম যেন সঙ্গীতকে দেখতে পেলাম।

এই বিরাট প্রতিভার সংস্পর্শে এসে যেন নতুন ক'রে হাতেখড়ি হ'ল তার—এক পুনর্জন্ম। প্রায়ই বলতেন রদ্যাঁ—শিল্প হ'ল প্রত্যহ চর্চার জিনিস, অভ্যাস আর সাধনাই আসল (Il faut toujours travailler)।

একদিন প্রতিবাদ ক'রে বসলেন এই তরুণ কবি। "সব কি আর আপনাদের মতো রোজ মডেলকে সামনে বসিয়ে মূর্তি গড়া? কবিতা তো আর ওভাবে লেখা যায় না! এই দেখুন না—আমিই তো কতদিন লিখিনি কবিতা—ইন্‌স্পিরেশন কই—ভাবই আসে না....."

মৃদু হাসলেন অগুস্ত রেনে রদ্যাঁ। "কে বলল লেখা যায় না? যাও, বাছো তোমার কবিতার মডেলকে। তারপর তাকিয়ে থাকো তার দিকে, দ্যাখো, গভীরভাবে ..... যতক্ষণ না সে-ই একটা কবিতা হ'য়ে ধরা দেয়। যাওনা, চেষ্টা ক'রে দ্যাখো....."

সেদিনই সেই তরুণ ছুটল জার্দাঁ দ্য প্লাঁৎ-এ (যেখানে চোদ্দ বছর বয়সে স্কেচখাতা হাতে হাতেখড়ি হয়েছিল রদ্যাঁর)। তারপর সেই উদ্ভিদ-উদ্যানে চিতাবাঘের খাঁচার সামনে বসে অরণ্যের প্রাণীর সেই করুণ বন্দী-রূপে যখন আচ্ছন্ন, আত্মহারা হ'ল সে, তখন তার কলম লিখল—

"খাঁচার ভিতরে, গরাদের পাশে, ঝাপসা চোখেতে ওর
ক্লান্তি, ক্লান্তি, কই ও তো কিছু তাকিয়ে দ্যাখে না আর
চারিদিকে ওর বন্ধন শুধু, শৃঙ্খল চারিধার—
আর কিছু নেই—স্বর্গ পৃথিবী, আছে শুধু পিঞ্জর!"
(Der Panther—চিতাবাঘ—*Neue Gedichte*, 1902)

সেই প্রথম বিখ্যাত কবিতা রাইনার মারিয়া রিল্‌কের। তারপর একইভাবে লেখা হ'ল Herbsttag (হেমন্তের দিন), Der ölbaumgarten (অলিভের বাগান), Die Erblindende (অন্ধ-হ'য়ে-যাওয়া), Das Karussell (নাগরদোলা), Auferstehung (পুনর্জন্ম) ইত্যাদি। ডায়েরিতে একশোরও বেশি এমন বিষয় (Dinge)-এর তালিকা তৈরী হ'ল ; এক-একটা বিষয় নিয়ে কবিতা লেখা হ'য়ে গেলে সেটা কেটে দিয়ে পাশে তারিখ লিখে রাখতেন রিল্‌কে। তাঁর মনে হ'তে শুরু করল, এটাও যেন একটা কাজ, অনেকটা রদ্যাঁর স্টুডিয়োতে বসে সেই অবিস্মরণীয় অথচ নিয়মিত সৃষ্টিকার্যের কাছাকাছি ; মনে হ'তে লাগল—কবিরা বোধহয় ঠিক ততোটা একাকীত্বের বেসাতি করেন না। তাঁর Das Stundenbuch (প্রহরের কবিতা)-এর চেয়ে এ যেন অনেক আলাদা—সম্পূর্ণ নতুন এক পথ, চিন্তা, অনুভূতি। "এটা একটা কাজ," স্ত্রীকে লিখছেন১ "হঠাৎ-আসা অনুপ্রেরণা থেকে ধ'রে-নিয়ে-আসা অনুপ্রেরণায় উত্তরণ!"

এই Neue Gedichte-র দুই খণ্ডের ১৭১টা কবিতা—ঠিক তাদের নাম যা বলে—আঙ্গিক, ভাবনা এমন কী দৃষ্টিকোণের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। রোবার্ট ম্যুসিল২—এর মতে, গ্যোটের পরবর্তী জার্মান কবিদের ইতিহাস স্থান দিয়েছে কোনও ডাকটিকিট সংগ্রাহকের আগ্রহে (বা উদাসীনতায়), কারণ গ্যোটের অলংকারে-ডোবানো অতিকথন (মহাকাব্যোচিত অতিশয়োক্তি)-এর নেশায় বিভোর ছিল উনবিংশ শতকের জার্মান কবিতা—বোদল্যের, মালার্মে কিম্বা স্তেফান জর্জ-এর বিদেশী কবিতার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে অবধি। রিল্‌কের কুড়ি বছরই ছিল নতুন ধারার জার্মান কবিতার কৈশোর এবং যৌবন—মহাকাব্য থেকে ছোট জমাট বাঁধুনির কবিতায় উত্তরণ। মহাকাব্যের জৌলুষ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, রোজকার মুখের ভাষায় সজ্জিত হ'য়ে, নতুন আঙ্গিকের ছোট কবিতার প্রচলন শুধু নয়—রিল্‌কে শেখালেন ভাষার সাবলীলতা আর চিন্তার তীব্র গভীরতা। রিল্‌কের সাহিত্যকীর্তি, বিশেষতঃ তাঁর আরও পরিণত Die Sonette an Orpheus (অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেটগুচ্ছ) আর Duineser Elegien (দুইনো শোকগাথা) বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে শুধু ল্যাণ্ডমার্কই নয়, তথাকথিত আধুনিক কবিতার নবজন্ম। এই শতকের ইউরোপীয়ান কবিতাকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য তো বটেই—এমনকী কল্লোল-পরবর্তী বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী কবি৩। যে-সাহিত্য তখনও শৈশবে, তার কোলে সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন এক মহীরুহের জন্ম—বিরল ঘটনা।

একজন কবি মূলতঃ পূর্বতন অথবা সমসাময়িক সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই খুঁজে পান নিজস্ব চরিত্র, গঠন করেন নিজস্ব সত্তা। কিন্তু রিল্‌কের কবিজীবনে যা আমাদের বিস্মিত করে তা হ'ল এই, যে তাঁর কবি-চরিত্র গঠনের মূলে রয়েছেন গত শতাব্দীর শেষভাগের দুই ভিন্‌দেশীয় শিল্পী, ইম্‌প্রেশনিস্ট ও পোস্ট-ইম্‌প্রেশনিস্ট যুগের দুই পথিকৃৎ ঃ অগুস্ত রদ্যাঁ—যাঁর বাড়ীতে তিনি ছিলেন একটানা পাঁচ মাস ও আগের চার বছরের কিছু-কিছু সময়, আর পল সেজান—যাঁকে তিনি কখনও চোখেই দেখেননি। তাঁর গড়ে-ওঠায় সমকালীন সাহিত্য ছিল নিতান্তই পার্শ্বচরিত্র। এমন কী ১৮৯৯-১৯০১ এ দু-বছর, যে-সময় তিনি "প্রহরের কবিতা" লিখছেন, সে-সময় তিনি এসেছেন লিও তলস্তয়-এর নিবিড় সান্নিধ্যে। তলস্তয় তাঁকে নিরাশ করেছিলেন—তাঁর ব্যক্তিত্ব, ধ্যানধারণা এবং চরিত্রে স্ববিরোধ আর সাহিত্যের প্রতি আনুগত্যের অভাব রিল্‌কের কাছে ছিল "the embodiment of a fatality, a misunderstanding"। এমনকী রিল্‌কের শিল্পসম্বন্ধীয় জ্ঞানতৃষ্ণাও বিন্দুমাত্র নির্বাপিত করতে পারেননি রুশ চিন্তাশীলতার সেই বিশাল ব্যক্তিত্ব ; তাঁর বহুলপ্রচলিত 'What is art ?'

রিল্‌কের চোখে হয়েছে 'লজ্জাজনক মূঢ়তা' আর তাঁর ধর্মীয় এবং নৈতিক চিন্তাধারা "আকর্ষণহীন অজ্ঞতা"।৪

অপরপক্ষে, শিল্পচর্চার প্রতি আপ্রাণ আনুগত্যের প্রতিমূর্তি হিসেবে তাঁকে আকর্ষণ করেছেন রদ্যাঁ, সেজান। 'একজন সন্ন্যাসীর জীবনে ঈশ্বর যতোটা, ততোটাই সেজানের জীবন জুড়ে ছিল তাঁর কাজ' লিখছেন রিল্‌কে। এমন কি, যিনি ছিলেন তাঁর জীবনের সব, সেই তাঁর মা-র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও অনুপস্থিত ছিলেন সেজান, কারণ তাঁর একটা ছবি তখন অসমাপ্ত ছিল। আর রদ্যাঁর জীবনে তাঁর সৃষ্টিকার্য ছিল তাঁর একাকীত্ব আর অনন্ত প্রকৃতির মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। 'সকালে নিদ্রাভঙ্গে তাঁর মূর্তিগুলো কথা বলতে শুরু করত তাঁর সঙ্গে, সেই থেকে সন্ধ্যে অবধি তারা ধ্বনিত হতে থাকত তাঁর দুই হাতে, কাজ শেষ হবার পরেও, বাজানোর পরেও যেমন বীণায় সুর লেগে থাকে'১১। কারও সঙ্গে দেখা হ'লে কুশলসম্বাদের বদলে জিজ্ঞাসা করতেন 'কাজ কেমন চলছে'? প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে হঠাৎ রাস্তার ধার থেকে একটা ছোট্ট ব্যাঙের ছাতা তুলে নিয়ে কেমন শিশুর মতো মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে ওঠেন স্ত্রীকে —দেখ, মাত্র এক রাত্তিরে তৈরী—এই সব! এই হচ্ছে সত্যিকারের কাজ!

রদ্যাঁ-সেজান এবং রিল্‌কে, এই তিন চরিত্রের বিনিময়ক্রিয়া—এ হ'তে পারত এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। কিন্তু এই স্বল্পপরিসরে এই বিশাল ক্যানভাসের প্রতি সুবিচার করা অসম্ভব, তাই এর গোড়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশকে শুধু তুলে ধরব—যে অংশের নায়ক এক শিল্পী, যিনি তাঁর কাজ আর সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অন্য এক দেশের সাহিত্যে। ইতিহাসে বিরল এই ঘটনাটির সময় ১৯০২-১৯০৬। এই সময়ে, রদ্যাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে যখন রিল্‌কে ছিলেন, তখন লেখা Neue Gedichte-র দুই খণ্ড তাই আমাদের আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ।

Neue Gedichte (নতুন কবিতা), যার এক খণ্ড 'A mon grand ami Auguste Rodin' উৎসর্গীকৃত, তার বিশিষ্ট অনুবাদক আঁদ্রে জিদ্ ফরাসী পাঠককুলের কাছে কবিকে তুলে ধরেছিলেন এই বলে—N'est-ce pas que par ce dernier livre Rilke prend place pres de nous?৫ এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে আছে অভূতপূর্ব এক মেলবন্ধন—আঙ্গিকের সাবলীলতা আর অনুভূতির গভীরতার (Innerlichkeit)। রিল্‌কের নিজের ভাষায় 'অবজেক্‌টিভ বাস্তবতার ওপর আরও কর্তৃত্ব (immer sachlicheren Bewältigen der Realität।৬ তাঁর বলার স্টাইলটা ভারী অদ্ভুত, কেমন নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি, অথচ অন্তর্ভেদী; —এক ঠাণ্ডা অবিচল ফলাকা যেন বিষয়বস্তুকে আলোড়িত, ছিন্নভিন্ন ক'রে তার অবজেকটিভ স্বরূপটাকে তুলে ধরে—অজানা কিন্তু ভীষণ-চেনা কোনও সুরের নেশা যেন আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে। যে-ব্যক্তির হৃদয়ের গভীরতম তন্ত্রীতে এ মধুর রাগিনী বাজে সে-ব্যক্তির দেখা নেই, অথচ সে-সুর আমাদের দুলিয়ে দিয়ে যায়।

সাহিত্যে ইম্‌প্রেশনিজ্‌মের এই অনন্য অবদান। মডেলকে যেমন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে ফুটিয়ে তোলেন শিল্পী ক্যানভাসে, তেমন গীর্জা, আপেল গাছ, জানলা, ফুল, বৃষ্টির আগে গ্রীষ্মকাল, কুকুর, পালংক কিম্বা কালো বেড়াল—এইসব এক একটা 'নতুন কবিতা'র বিষয়কে এ'কে চলে আশ্চর্য অনুভূতিশীল এক নিরাসক্ত কলম। 'তোমার কী নতুন কবিতাগুলোকে খুব নৈর্ব্যক্তিক বলে মনে হয়? দ্যাখো, ঠিক অনুভূতি দিয়ে নয়, এগুলো মাটি দিয়ে গড়া; আমি অনুভূতির বিচার করিনি, যাদের অনুভব করি তাদের গড়েছি ছন্দের মধ্য দিয়ে।'৭ এই 'Dinggedichte'—বস্তুর কবিতা—এর মূলে যে অন্তর্দৃষ্টি (Einsehen)—যা খুব পার্থিব, অথচ গভীর; যার জন্ম হয়তো কোনও বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে অথবা অন্তর্নিহিত ধর্মবিশ্বাসের আনুগত্য থেকে—তা শুধু চোখের বাহিরে চোখের আলোয় দেখা কোনও কিছুকে, যখন আলোক নাহিরে, তখন অন্তরে অনুভব করা। 'এখানে এসে একাত্মভাবে মিলেছে দুই ভিন্ন মতবাদের কবিতা—রোমান্টিক কবিতা, যেখানে প্রাধান্য পেতো কবির নিজস্ব অনুভূতিশীলতা, আর মালার্মে প্রভৃতির

অ্যাবসোলিউট কবিতা—যেখানে কবির ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলনের কোনও স্থান নেই '।৮

এই অবজেক্‌টিভিটি (Sachlichkeit) এবং অন্তর্দৃষ্টি (Innerlichkeit),—রিল্‌কের জীবনে তথা বিশ্বসাহিত্যের এই বৈপ্লবিক মুহূর্তে এক ফরাসী শিল্পীর অমূল্য অবদান। মাতৃভাষার কাছে সাহিত্যিক অনুপ্রেরণা রিল্‌কে পেয়েছেন অল্পই; রুশভাষা, তলস্তয় তাঁকে হতাশ করেছে। এবং এলিজাবেথ ব্রাউনিংয়ের কবিতার অনুবাদক হ'লেও নিজেই স্বীকার করেছেন—ইংরেজী ভাষায় অপটুত্ব তাঁকে ইংরেজী সাহিত্যে বেশীদূর অগ্রসর হ'তে দেয়নি (৪)। অপরপক্ষে রদ্যাঁ তাঁর পরিচয় ঘটিয়েছেন ফরাসী সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে, ফরাসী জীবনযাত্রা আর চিন্তাধারার সঙ্গে, শার্ল বোদলেয়ের কবিতার সঙ্গে; এবং সমসাময়িক ফরাসী সাহিত্যের দুই অবিস্মরণীয় চরিত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা তাঁর হয়েছে রদ্যাঁরই দৌলতে—পোল ভালেরি আর আঁদ্রে জিদ্। বুডলফ্ কাসনার-এর মতে, একমাত্র ফরাসী জীবনধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগই তাঁর কবিতায় বুর্জোয়াসুলভ আত্মম্ভরিতার অনুপ্রবেশ রুখেছে—যা তাঁর কবিতাকে উনবিংশ শতকের জার্মান কবিতার থেকে এ্যাতো আলাদা আর এ্যাতো শ্রেয় ক'রে তুলেছে।

১৯০২এ যখন প্রথমবার পারীতে এসেছিলেন রিল্‌কে, তখন রদ্যাঁর সৃষ্টির ওপর বই লেখার উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রায় রোজই ম্যদোঁ (Meudon)-তে রদ্যাঁর বাড়ীতে যেতে হ'ত। "সে সময় আমি কোনও শিল্পকর্মকে আঙ্গিকের দিক দিয়ে বিচার করতে পারছি কিছুটা৯ শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের কাছে আর আগের মতো অত সহজে নতিস্বীকার করিনা।.....প্রথম থেকে তাঁর সঙ্গে দারুণ প্রাণবন্ত কথোপকথনের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠল, আর আমার মধ্যে গভীরতর হ'ল মুগ্ধ বিস্ময়ের রত্নাকর"(৪)। তারপর, সেই বইয়ের প্রকাশের পর, যখন ১৯০৪ এ তিনি সুইডেনে, নানা জায়গা থেকে রদ্যাঁর ওপর বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ আসছে—তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করতে ইচ্ছে হ'ল, চিঠি লিখলেন জানতে তিনি তখনও ম্যদোঁতেই আছেন কিনা। উত্তরে এল এক লাইনের টেলিগ্রাম—"Monsieur Rodin y tient, pour pouvoir causer" (এখানে চলে আসুন, গল্পগুজব করা যাবে)। তারপর পাঁচ মাস রদ্যাঁর বাড়ীতে অতিথি হিসেবে ছিলেন রিল্‌কে—তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক সময়।১০

"সাহিত্য আমাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে অল্পই.....এই মহান্ শিল্পীর প্রত্যক্ষ এবং বিচিত্রগামী অনুপ্রেরণা এই সাহিত্য-প্রভাবের চেয়ে যে অনেক অনেক বেশী ছিল শুধু তাই নয়, বরং তাকে নিষ্প্রয়োজন ক'রে তুলেছিল। আমার পরম সৌভাগ্য আমি রদ্যাঁর সংস্পর্শে এসেছিলাম এমন সময়ে যখন আমার অন্তর তৈরী হ'য়ে ছিল আকৃতি পাবার জন্য.....তলস্তয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত এক ব্যক্তিত্ব; একজন মানুষ, যাঁর সৃজনশীল জিনিয়াস পূর্ণমাত্রায় কর্মক্ষম আর সলীল অসীম, আমার অন্তরকে ঘিরে রেখেছিল—তাঁর চিন্তাধারা, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, শুধুমাত্র তাঁর পাথরের মূর্তিগুলো দিয়ে নয়।" (৪ সেই পাঁচমাস মুগ্ধ বিস্ময়ে রিল্‌কে ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁর স্টুডিয়োয়, তাঁর কাজের মধ্যে, তাঁর সঙ্গে।

সেইসব কালজয়ী পাথর-ব্রোঞ্জের মূর্তির নিঃশ্বাসে তিনি খুঁজে পেয়েছেন 'যন্ত্রণায় বা ভালোবাসায়, দুঃখে বা সুখস্বপ্নে আমাদের অনুভবে যা-কিছু চূড়ান্ত; ভোরের আকাশে সূর্য্যোদয়ের আবেশের মতো, নিদ্রাঘোরা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ যেন।' যে মানুষটা গালে হাত দিয়ে ভাবছে—ভাবছে যেন সারা শরীর দিয়ে, নিজের মধ্যে নিয়েছে আশ্রয়; নিজের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ ঈভ যেন দূরে সরিয়ে রাখতে চায় সবকিছুকে, এমনকি নিজের বদলে-যাওয়া; পদচারী মানুষের হাঁটার ছন্দ যেন অনুভূতির শব্দকোষে এক নতুন সংযোজন; নাক-ভাঙা মুখাবয়ব ঃ যাকে ভুলতে পারা যায় না, হঠাৎ-তোলা মুষ্টিবদ্ধ হাতের মতন—এ-সব কিছুর নাম একটাই ঃ রদ্যাঁ। 'তাঁর সৃষ্টিতে কোনও ঔদ্ধত্য ছিল না। সৌন্দর্যের অনুল্লিখিত খুঁটিনাটির প্রতি ছিল তাঁর অক্লান্ত মনোযোগ, অসীম ক্ষমতা—যা ঠিকমত গড়ে তুলতে পারলে সৌন্দর্যের বৃহত্তর অংশের আবাহন ঘটে অতি সহজেই—ঠিক যেমন সন্ধ্যে নামলে জনহীন বনপ্রান্তে জল খেতে আসে গভীর অরণ্যের প্রাণি-

কূল'১১। এর মধ্যেই রদ্যাঁ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর জীবন, আশ্চর্য সুন্দর জীবন ঃ 'La vie, cette marveille'.

আর এই আশ্চর্য জীবনের এক একটা মুহূর্ত এক একটা বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে রিল্‌কের কবিতার। 'আমাদের পাশ দিয়ে বয়ে যায় কতকী, কত চরিত্র, পুরুষ-নারী. আবার পুরুষ-নারী। দেখতে দেখতে এক সময় দৃশ্যপট সহজতর হ'য়ে ওঠে আমরা দেখি ঃ বস্তু (Dinge)। এ-কথাটা উচ্চারণ করার পর একটা নৈঃশব্দ্য নেমে আসে (শুনতে পাচ্ছেন?)। সেই নৈঃশব্দ্য ঘিরে থাকে সেই বিষয়বস্তুকে। সব গতি থেমে আসে, সময়ের স্রোতের মধ্যে থেকে উঠে আসে স্থির আকৃতি'। (১২)

দোতলায় তাঁর ঘরের জানলা দিয়ে দেখা বাগানে রদ্যাঁর বুদ্ধমূর্তি ভীষণ আকৃষ্ট করত তাঁকে, কেমন জীবন্ত,—তাঁর কবিতাতেই আছে সে মুগ্ধতার নিদর্শন ঃ

> "যেন তিনি শুনছিলেন। নিস্তব্ধ দূরত্বে
> আমাদের বুদ্ধশ্বাস শ্রবণ ক্ষীণ হ'ল।
> যেন তিনি নক্ষত্র এক। বড়ো তারকারাও
> আমাদের দৃষ্টির বাইরে, তাঁর পদপ্রান্তে.....
>
> ...কারণ যা আমাদের তুলে দাঁড় করায়
> তা লক্ষ বছর ধ'রে তাঁর মধ্যেই ঘুরেছে।
> তিনি ভুলে আছেন আমাদের সুখদুখ সেই চিন্তায়—
> যার থেকে পালিয়ে বেড়াই আমরা, অনন্তকাল!"
>
> (Buddha, *Neue Gedichte,* 1905)

এইরকম কোনও বিষয়ের, কবিতার 'মডেলের' একেবারে অন্তঃস্থলে চলে যাওয়ার দিব্যদৃষ্টি তাঁকে দিলেন রদ্যাঁ। "ধরা যাক, কুকুর। কবির দৃষ্টি সমাহৃত হবে সেই কুকুরের কেন্দ্রস্থলে, যেখান থেকে সে কুকুর হ'য়ে উঠতে শুরু করেছে, যেখানে সেই কুকুরের প্রাণদানের মুহূর্তটিতে সৃষ্টিকর্তার চেতনা প্রক্ষিপ্ত হ'য়েছিল তাঁর সৃষ্টির প্রথম প্রতিক্রিয়া যাচাই করার জন্য, তার পূর্ণতা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হবার জন্য.....হয়তো তুমি হাসছো, বন্ধু—কিন্তু জেনে রাখো, আমি আমার জীবনের পরম গভীর সময়হীন মুহূর্তগুলোকে খুঁজে পেয়েছিলাম এই অন্তর্দৃষ্টি (Einsehen)-র মধ্যেই।"(১৩) এমনিভাবেই কয়েকটা প্রস্তরীভূত মুহূর্ত আর অনুভূতির ফসিল ধীরে ধীরে হ'য়ে উঠল কবিতা—গড়ে উঠল 'পাথরের শহর'।(১৪) ব্লেক এর 'Vegetable Universe' কিম্বা ইয়েট্‌স্-এর সিম্‌বলিক জগতের ওপারে, হৃদয়মর্মরের এক অতি-প্রাকৃত জগতে আমাদের হাত ধ'রে নিয়ে যাবার ক্ষমতা অর্জন করলেন রিল্‌কে। কোনও বস্তু, ঘটনা কিম্বা পৌরাণিক উপকথাকে এই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে শুধুমাত্র বর্ণনা করেননি রিল্‌কে, তাদের নবজন্ম দিয়েছেন—তাদের একক অস্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং এইভাবে সম্মুখীন হয়েছেন 'আমরা কে?' 'আমরা কেন?' 'আমরা কী করতে চাই?' এমন সব সাঙ্খ্যাতিক প্রশ্নের, যার বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে 'নতুন কবিতায়'—আর চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে 'দুইনো শোকগাথা'য়।

এমনকী পৌরাণিক কাহিনীগুলোও তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন রদ্যাঁ। বাইবেল-আধারিত আদম-ঈভ, ডেভিড ও সল, কিম্বা উপকথার অর্ফিয়ুস-ইউরিদিকে বা সাফো অথবা কাব্যের ডন জুয়ান কিম্বা এরিয়েলকে নিয়ে রিল্‌কের কবিতা রদ্যাঁর ভাস্কর্য-অনুপ্রাণিত। "এক একদিন খোলা বই হাতে—হয়তো মাদ্রাসের আরব্য রজনী—তিনি (রদ্যাঁ), চলে আসতেন; ডাক্তারের প্রেস-ক্রিপশনের চেয়ে লম্বা নয়, এমন একটা ছ'লাইনের কবিতা হয়তো তাঁর মনে তখন কুসুমিত হ'য়ে উঠেছে—চলে এসেছেন, যাতে তার সুরভির অংশীদার আমিও হ'তে পারি"।(১৫) এইভাবেই গড়ে উঠল নতুন কবিতা, রিল্‌কে রিল্‌কে হ'য়ে উঠলেন, এল জার্মান কবিতার যৌবন আর বিশ্বসাহিত্যের এক নতুন মোড়। আর, কবিতায় ইম্‌প্রেশনিজমের অনুপ্রবেশের উৎস হ'য়ে সাহিত্যে বেঁচে রইলেন চিরকাল এক ফরাসী ভাস্কর, যিনি নিজে এক লাইন কবিতা লেখেননি. অথচ শিল্পের ক্ষেত্রে ছিলেন স্বয়ং এক প্রতিষ্ঠান।

উদাহরণ হিসেবে রিল্‌কের একটি কবিতার অনুবাদ এখানে সংযোজিত হ'ল : 'কবির মৃত্যু' (Der Tod des Dichters), পারীতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা, রদ্যাঁর ভাস্কর্য La Mort du Poete অবলম্বনে। রিল্‌কের সবচেয়ে বেশী আলোচিত কবিতার একটা বলেই শুধু নয়, তাঁর স্টাইলের প্রতিনিধি হবার দাবী রাখে বলেই এখানে উপস্থাপিত হ'ল। একজন কবির একান্ত নিজস্ব উপলব্ধির আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিক এক উপস্থাপনা এখানে—যে-কথা রদ্যাঁ দেখিয়েছিলেন ব্রোঞ্জে, রিল্‌কে বলেছেন চোদ্দ লাইনের নিখুঁত শব্দচয়নের মধ্য দিয়ে।

সবশেষে রিল্‌কের এপিটাফ। তাঁর দুর্বোধ কাব্যের চূড়ান্ত এই নিদর্শন নিয়ে পৃথিবীর নানা ভাষায় বহু প্রবন্ধ লেখা হ'য়েছে এবং হচ্ছে। ভালো লাগাটা পাঠকের এক্তিয়ারে।

[অনুবাদ প্রসঙ্গে : রিল্‌কের কবিতা এবং চিঠি মূল জার্মান থেকে লেখক-কর্তৃক অনূদিত। জার্মান কবিতার বাক্যরীতি এবং শব্দের সূক্ষ্ম পার্থক্য হুবহু তুলে ধরা দুঃসাধ্য—তবে রিল্‌কের স্টাইল যতদূর সম্ভব রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুবাদ মূলতঃ আক্ষরিক —যদিও কবিতার ক্ষেত্রে অনুবাদ নয়, ভাষান্তর (transcreation) আখ্যাই বোধ হয় এখানে যুক্তিসংগত।]

কবির মৃত্যু

তিনি শুয়ে ছিলেন। তুলে-ধরা নীরক্ত মুখে
উপেক্ষা—এ বড়ো অনীহ আবরণ!
এখন যে পৃথিবী আর যা-সব সচেতন
তাঁর সংবিৎ থেকে ক'রে সংবরণ,
নিজেদের ভাসিয়েছে অনাসক্ত সময়ের বুকে!

তারা, যাঁরা তাকে জীবিত দেখেছে, বোঝেনি
এ-সব কিছুর মাঝে লীন তাঁর অন্তর,
এইসব, এই যে অতল খাদ, সবুজ প্রান্তর,
আর এই ঝরণা—এ ছিল তাঁর মুখচ্ছবি!

তাঁরই মুখ, এই নিরন্ত সুদূর ধূধূ
অশ্রু ঝরায় আজও যাকে কাছে চেয়ে।
আর ঐ যে, রয়েছে মৃত্যুর পথ চেয়ে
মাটিতে পতিত ফলের মর্ম শুধু
দীর্ণ নম্র, তাঁর মুখোশমাত্র যে এ।

এপিটাফ

R. M. R.

4 December, 1875—29 December 1926

Rosa, O reiner Widerspruch, Lust
Niemandes Schlaf zu sein unter soviel
Lidern.

গোলাপ, হে পরম বিরোধ, আনন্দ তোমার
সকলের চোখে আছো, কারও ঘুম না হ'য়েও!

[এই বারোটি শব্দের ব্যঞ্জনার অংশমাত্রও ভাষান্তরিত হয়নি এক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ, শেষ শব্দটি (Lider) ব্যবহৃত হয়েছে 'চোখের পাতা' অর্থে, অথচ পড়লেই মনে পড়ে সমোচ্চারিত Lieder শব্দটি, যার অর্থ 'গান'। অর্থাৎ মনের গভীরে দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ দাঁড়ায় : 'সব সঙ্গীতে আছো, কারও ঘুম না হ'য়েও!]

উল্লেখসারণি

১। Clara Rilke কে লেখা চিঠি : 9 August 1907

২। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায়, রিল্‌কের মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পরে, বিখ্যাত এই অস্ট্রিয় ঔপন্যাসিক-সমালোচক এই মর্মে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন—তা লিপিবদ্ধ আছে Tagebücher, Aphorismen, Essays und Reden (1955) গ্রন্থে—p 885.

৩। বুদ্ধদেব বসু এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় রিল্‌কে অনুবাদ করেছেন বাংলায়। ১৯৭০ এ প্রকাশিত শান্তনু দাস, রুদ্রেন্দু সরকার সম্পাদিত 'স্বনির্বাচিত' গ্রন্থে 'প্রিয় বিদেশী কবি কে ?' প্রশ্নের উত্তরে রিল্‌কের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্বীকার করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, তুষার রায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শামসুর রহমান এবং আল মাহমুদ।

৪। Professor Hermann Pongs কে লেখা চিঠি ; 27 October 1924– নিজের সম্বন্ধে লেখা এক অমূল্য দলিল।

৫। Madame Mayrisch কে লেখা জিদের চিঠি ; 14 January 1911 (Rainer Maria Rilke—Andre Gide ; Correspondance, Paris, 1952, p 53) অর্থ : রিল্‌কের এই নতুন বইটি কি তাঁকে আমাদের পাশে স্থান ক'রে দেয় না ?

৬। Anton Kippenberg কে লেখা চিঠি : 18 August 1908

৭। ফরাসী ভাষায় লেখা চিঠি 'A une Amie' : 3 February 1923 (Ausgewählte Briefe, 1950, II, p309)

৮। Rose W and Houston GC (ed.), *Rainer Maria Rilke : Aspects of his Mind and Poetry*, 1938—এই গ্রন্থের 'Neue Gedichte' নামক প্রবন্ধ। লেখক Sri Maurice Bowra.

৯। এর আগে ১৮৯৮তে রিল্‌কে ফ্লোরেন্সে ইতালীয় শিল্পে রেনেসাঁস নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন।

১০। রিল্‌কে পারীতে থাকাকালীন রদ্যাঁর সেক্রেটারী ছিলেন—এরকম একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, তার মূলে বোধহয় পেঙ্গুইন সিরিজের তাঁর কবিতার বহুল-প্রচারিত সংকলনে J B Leishman লিখিত ভূমিকা। এমনকি কোলকাতায় রদ্যাঁর প্রদর্শনী চলাকালীন নামী পত্রিকাগুলোতেও এ-মর্মে কিছু লেখা বের হয়। Alfred Schaerকে লেখা 26 February, 1924 এর চিঠিতে রিল্‌কে নিজে এই গল্পটিকে "obstinate legend" বলে অভিহিত করেছেন—এতএব এ-ধারণা তাঁর জীবদ্দশাতেও প্রচলিত ছিল। (৪) সংখ্যক পত্রে তিনি বলেছেন—"আমি কোনদিনই রদ্যাঁর কাছে ছিলাম না—যদি সেটা কর্মচারী হওয়া বোঝায়। তাঁর শিষ্য ছিলাম, এমনকী বন্ধুও। যে পাঁচ মাস তাঁর বাড়ীতে অতিথি ছিলাম—সে-সময়ে তাঁর আতিথ্যের প্রতিদান হিসেবে তাঁর চিঠিপত্রের উত্তর লিখে দিতাম।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই চিঠির উত্তর দেওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারেই এক ভুল বোঝাবুঝি হবার দরুণ রিল্‌কে রদ্যাঁর বাড়ী ছেড়ে চলে যান।

১১। Rilke, RM ; *Auguste Rodin,* erster Teil (1903), Sämtliche Werke, *5*, p 141

১২। ঐ, zweiter Teil (1907), ibid, p 205

রদ্যাঁর ওপর রিল্‌কের লেখা দু খণ্ডে প্রামাণ্য গ্রন্থ।

১৩। Magda von Hattingberg-কে লেখা চিঠি : 17 February 1914 (Briefwechsel mit Benvenuta, 1954 p 94)

১৪। Fritz Dehn এর Neue Gedichteর ওপর বিখ্যাত সমালোচনাকার্যের নাম Die Steinerne Stadt (পাথরের শহর) —R. M. Rilke und Sein Werk (1934)

১৫। Lotti von Wedel কে লেখা চিঠি : 28 January 1922.

নম্-ডি-প্লুম্

রঞ্জন লাহিড়ী

সকাল।

সকাল কারণ অ্যালার্ম বাজছে। উঠতে হবে কারণ সকাল। পাশ ফিরে শোয়া চলবে না, কারণ অ্যালার্ম বাজছে। হাত বাড়িয়ে ঘড়ির মুণ্ডুটা টিপে দেও। যাবে না, কারণ রাত্রে ওটাকে ইচ্ছে করেই এমন জায়গায় রাখা হয়েছে, যাতে শুয়ে শুয়ে হাত না পাওয়া যায়।

ঝাপসা চোখে উঠে মিস্টার চ্যাটার্জি পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিলেন। কি ব্যাপার, আলো এতো কম ঠেকছে কেন? চোখের সামনে ডিফেন্সিভ ভঙ্গিতে রাখা হাতটাকে সরিয়ে ফেললেন আস্তে আস্তে। চোখ ধাঁধাচ্ছে না। একটু লালচে আভা এখনো রয়েছে আকাশে। রাত্রে শোবার সময় ঘড়িতে দম দিতে গিয়ে অ্যালার্মের কাঁটাটা ঘুরে গিয়ে থাকবে।

সূর্য। সকালবেলার লাল সূর্য। শার্সির ছিটকিনিটা ছাই খুলছে না কেন? বাইরে গাছের ডালগুলো আড়ামোড়া ভাঙছে হাল্কা বাতাসে; মিস্টার চ্যাটার্জির প্রচণ্ড গরম লাগছে।

আ আঃ! পায়ে পায়ে এসে আবার খাটে শুয়ে পড়লেন মিস্টার চ্যাটার্জি। শরীরের ওপর দিয়ে ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। চোখের পাতার কাছটা একটু চিন্‌চিন্ করছে। কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে দেহটা। ঘুম আসছে। একটি ঘণ্টা সময়, খাঁটি ঘুম ঘুমোনোর জন্যে। এক ঘণ্টা কেন, ইচ্ছে করলেই তো এটাকে আরো বাড়িয়ে নেওয়া যায়। সারাদিন! অসুখ বিসুখও তো করে লোকের। বাঃ, সুন্দর তো এই কাপড়টা। কত করে মিটার? এই নদীটার নাম কি? আর তোমার? বাঃ, বেশ নাম তো! তুমি আমাকে রাস্তা বলে দেবে? কোথায় যাবো সে তো জানিনা। মন্দির? মন্দির আছে বুঝি এখানে? আচ্ছা, ওখানেই যাই তবে। আমার লাঠিটা তুলে দেবে খুকি? কি সুন্দর আরতি হচ্ছে, আগুন জ্বলছে প্রদীপে, ঘণ্টা বাজছে কি মিষ্টি সুরে। আরে, একটু আস্তে বাজাও না ঘণ্টাটা, অত জোরে বাজাচ্ছ কেন? আমার কানে লাগছে যে!

ধড়মড় করে উঠে বসলেন মিস্টার চ্যাটার্জি। টেলিফোন। ঘড়ির দিকে তাকালেন — সাড়ে সাতটা। ইস্! এতক্ষণ ঘুমোলাম পড়ে পড়ে!

'চ্যাটার্জি। ইয়েস সার। হ্যাঁ সার, এক্ষুনি।'

দাঁত মাজতে মাজতে, জামা পরতে পরতে, টাই বাঁধতে বাঁধতে, জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। কি যেন নাম বলেছিলো মেয়েটি? নদীটারই বা কি নাম ছিলো?

ঐ ঝিরঝিরে নদীটার ধারে যদি অনেকক্ষণ বসে থাকা যেতো, ঠাণ্ডা জলে পা ডুবিয়ে এপার থেকে ওপারে ব্যাঙ্‌বাজি করা যেতো! কিম্বা নদীর ধার দিয়ে লম্বা একটা দৌড়, ঘাস আর আকাশ, আকাশ আর ঘাস, ফোঁটা ফোঁটা শিশির—

পেছন থেকে প্রাইভেট বাসের হর্নে খেয়াল হলো, সিগন্যাল খালি পেয়ে সামনের গাড়িগুলো অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মিস্টার চ্যাটার্জি স্টার্টার সুইচের দিকে হাত বাড়ালেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ একটি দৃষ্টিকোণ

অয়নেন্দ্রনাথ বসু

সূচনা : জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। বিষয়টি একদিকে যেমন আকর্ষণীয় অন্যদিকে তেমনই অস্পষ্ট, কারণ দেশে দেশে আমরা এই সম্পর্কের সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র দেখতে পাই। জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে উভয়ে উভয়কে যথেষ্ট প্রভাবিত করে এটা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু সেটা কত বিচিত্রভাবে এবং কতদূর পর্যন্ত, অথবা কয়েকদশক আগের চেয়ে তার চরিত্রগত পার্থক্য কি, এবং কেন ও কিভাবে দেশের অন্যান্য সম্পদগুলি তাকে প্রভাবিত করে এই তত্ত্বগুলি সহজে সাধারণ লোকের কাছে পরিস্ফুট হয়না।

জনসংখ্যার সমস্যা : তৃতীয় বিশ্বে এর তাৎপর্য : জনসংখ্যার বৃদ্ধিমাত্রই যে ক্ষতিকর এসব কথা মনে করা ভুল। সাধারণ সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম হলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। তবু সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের পক্ষেই জনসংখ্যার বৃদ্ধি আর অভিপ্রেত নয়। ১৭৯০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ, যা ৭½ কোটিতে দাঁড়ায় ১৯০০ সালে এবং ১৮ কোটি হয়ে যায় ১৯৬০ সালে। এই উদাহরণের সাহায্যে বুঝতে সুবিধে হবে যে পৃথিবীর লোকসংখ্যা গত অল্প কিছুকালের মধ্যে এত দ্রুতহারে বেড়েছে যে সাধারণ সম্পদের সীমাবদ্ধতার তুলনায় তাকে আর বাড়তে দেওয়া অনুচিত। বর্তমান বৃদ্ধির হার বজায় থাকলে এই শতকের শেষে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ৭০০ কোটি।

ভারত সহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপটা শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় একটু বেশী মাত্রায় অনুভূত হচ্ছে। তর্ক উঠতে পারে যে ইস্রায়েল, জাপান প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি যদিও এই সব দেশগুলিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে একটা শিল্পসমৃদ্ধ দেশ একটা কৃষিভিত্তিক দেশের চেয়ে বড় জনসংখ্যা বহন করতে পারে। সহজ কথায় জনসংখ্যার সমস্যা প্রধানতঃ উন্নয়নশীল দেশগুলিরই সমস্যা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বর্তমান আলোচনা সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে এবং বিশেষ করে ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

ভারতবর্ষে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনেক কুফল সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। যেমন

১. নিম্নহারের মাথাপিছু আয়
২ বৃহত্তর জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সংস্থানের সমস্যা।
৩. তীব্র বেকার সমস্যা।
৪ মূলধন সঞ্চয়ে (capital accumulation) অসুবিধা।
৫. জনসংখ্যায় অনুৎপাদক মানুষের অনুপাত বৃদ্ধি।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার খুব বেশী ছিলনা, কারণ জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই ছিল প্রায় সমান। তৃতীয় দশক থেকে সরকারের নেওয়া নানান ব্যবস্থা (যেমন চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি, বন্যা, খরা ও অন্যান্য দৈবদুর্যোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ইত্যাদি) মৃত্যুহারকে দ্রুত কমিয়ে আনে কিন্তু জন্মহার প্রায় একই রয়ে যায়। ফলে জনসংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকে।

ভারতের সমাজব্যবস্থা, (যথা একান্নবর্তী পরিবার প্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি) বয়স আনুপাতিক জনসংখ্যার

গঠন, (ভারতবর্ষের জনসংখ্যায় বয়স্ক মানুষের অনুপাত কম) ইত্যাদি ভারতের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বলে মনে করা যেতে পারে। উপরন্তু ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং এদেশের কৃষি এখনো মূলতঃ শ্রমভিত্তিক, প্রযুক্তিভিত্তিক নয়, এই কারণে হয়তো একজন সাধারণ ভারতীয় কৃষকপিতা অধিকতর পুত্র-সন্তানের জনক হতে চান।

জনসংখ্যা প্রসঙ্গে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব ও মার্ক্সীয় অভিমত ঃ জনসংখ্যা সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনায় ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। তত্ত্বটি যদিও উপস্থাপিত হয় ইংল্যাণ্ডে (১৭৯৮ সালে) এর যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের অনুন্নত দেশগুলির দিকে তাকাতে হবে।

ম্যালথাসের মতে যে কোনো প্রাণীই লভ্য আহার্যের তুলনায় দ্রুততর গতিতে বংশবৃদ্ধি করার একটা প্রবণতা দেখায়। কৃষির জন্য লভ্য ভূমি অপরিমিত নয় এবং কৃষিব্যবস্থার নানান জটিলতাও আছে। ফলে ম্যালথাস মনে করেছিলেন যথেষ্ট অনুকূল অবস্থাতেও খাদ্যোৎপাদন শুধুমাত্র সমান্তর শ্রেণীতে বাড়তে পারে, কিন্তু জনসংখ্যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ গুণোত্তর শ্রেণীতে বাড়তে পারে, যদি না কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সত্যতা মেনে নিলে লোকসংখ্যা ক্রমাগতই লভ্য আহার্যের অনুপাতে বেশী বেড়ে যেতে থাকবে। শিক্ষিত মানুষ যদি তার আত্মসংযমের সাহায্যে জন্মহার না কমিয়ে আনে তবে কখনো কখনো যুদ্ধ মহামারী, বন্যা, খরা ইত্যাদিতে জনসংখ্যা হ্রাস পেতে পারে। উপরন্তু ম্যালথাস এও দেখেছিলেন যে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য ও ন্যূনতম খাদ্যশস্যের মধ্যে এক বিরাট প্রভেদ আছে। ফলে যতদিন ন্যূনতম খাদ্য পাওয়া যায় ততদিন জনসংখ্যা বাড়তেই থাকবে কিন্তু পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে মানুষ স্বাস্থ্যহীনতা ও অপুষ্টিতে ভুগতে থাকবে।

ম্যালথাস যে সময়ে তাঁর তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন সে সময় থেকে পৃথিবী এখন অনেক বদলে গেছে। কৃষিকার্য ও খাদ্যসংস্থান ক্রমেই আমাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের এক ক্ষুদ্রতর অংশে পরিণত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে দেশের ব্যয়যোগ্য ব্যক্তিগত আয়ের কেবলমাত্র ১৩ শতাংশ খাদ্যের জন্য ব্যয় হয় এবং তারও প্রায় এক তৃতীয়াংশ কৃষকের হাতে পৌঁছায়। এর দুটি প্রধান কারণ হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি এবং খনিজ তেল থেকে উদ্ভূত যান্ত্রিকশক্তির ব্যবহার। অনুন্নত দেশগুলিতেও সবুজ বিপ্লব (Green Revolution) খাদ্যোৎপাদনকে বিস্ময়কর ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই ভবিষ্যতের খাদ্যসংস্থান সম্পর্কে ম্যালথুসীয়দের যে ভীতি তাকে আধুনিক যুগ অনেকটাই লাঘব করতে পেরেছে।

নব্য ম্যালথুসীয়রা (neo-Malthusians) অবশ্য অনেক নতুন সমস্যার কথা ভেবে ভবিষ্যতের খাদ্যসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে প্রধান হল পরিবেশ দূষণ। কিন্তু কিন্তু শিক্ষিত মানুষ এখনই পরিবেশ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে ও এই সমস্যা যাতে ভবিষ্যতে বড় আকার ধারণ না করে সেজন্য সচেষ্ট হয়েছে। শক্তি সঙ্কটের (energy crisis) মোকাবিলা করার জন্যও আমরা আজ প্রস্তুত।

মানবজাতির সচেতন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ম্যালথুসীয়রা যে বিপদের কথা বলেছেন তাকে আমরা এড়াতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশসমূহে, পূর্ব ইউরোপের কিছু সমাজতন্ত্রী দেশে, সোভিয়েত রাশিয়ার কিছু অংশে, জাপানে ও আরো কিছু জায়গায় জনসংখ্যা প্রায় না-বৃদ্ধি না-হ্রাসের স্তরে এসে গেছে। কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশেও জন্মহার দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, যেমন দক্ষিণ কোরিয়া। ফলে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব আজ আর সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয় যদিও এর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা আজও অনস্বীকার্য।

ম্যালথাস প্রসঙ্গে মার্ক্সবাদী মতামতের কথা আমরা ভেবে দেখতে পারি। মার্ক্সবাদীরা অত্যধিক জনসংখ্যার ধারণাকে ক্রমাগতই নিন্দা করেছেন ও প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন যে ম্যালথুসীয় তত্ত্বকে মেনে নেওয়ার মানে এ-কথাকেই স্বীকার করে নেওয়া যে সমাজের দুঃস্থ মানুষদের দুর্দশার জন্য দায়ী

তাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি 'করার প্রবণতা'। কিন্তু মার্ক্স-বাদীরা বিশ্বাস করেন যে উচ্চস্তরের মানুষদের শোষণেই সমাজের গরীবদের দুর্দশা। তাঁরা তাই ম্যালথুসীয় তত্ত্ব মানতে রাজী নন। কিন্তু আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুফল সম্বন্ধে মার্ক্সবাদীরা যতটা উচ্ছ্বসিত (অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন) ততটা উচ্ছ্বাসের কারণ আজকের পৃথিবীতে আর নেই। একথাও আমরা মনে না করে পারিনা যে ব্যক্তিগত মতামতের ভিন্নতা ও মার্ক্সীয় মতবাদের সঙ্গে ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সাযুজ্যের অভাবই মার্ক্সকে তাড়িত করেছে ম্যাল-থাসের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে এবং হয়তো এই কারণেই মার্ক্স ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সঠিক সামাজিক তাৎপর্য সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারেননি।

এই কারণেই একথা মনে হওয়া সঙ্গত যে বর্তমান বিশ্বের উন্নয়ন সমস্যা গোঁড়া ম্যালথুসীয় বা গোঁড়া মার্কসবাদী কোনো মতামতের সাহায্যেই সম্পূর্ণ সমাধান করা সম্ভব নয়। উভয়েই অংশত সঠিক কিন্তু উভয়ের সীমাবদ্ধতাগুলোও আমাদের কাছে আজ পরিষ্কার।

স্বাধীনতার পরেই ভারত সরকার অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা সীমিত রাখার চেষ্টায় যত্নবান হন। ভারতীয় মার্কসবাদীরা সাধারণ ভাবে পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রথার বিরোধিতা করেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমরা অধ্যাপক জ্ঞানচাঁদের নাম করতে পারি। তিনি স্বীকার করেন যে আমাদের জনসংখ্যাকে অত্যধিক বাড়তে দেওয়া অনুচিত। তিনি একথাও বলেছেন যে হয়ত খানিকটা ব্যক্তিগত আক্রোশেই এবং যথার্থভাবে তাঁর তত্ত্বকে অনুধাবন করতে চেষ্টা না করেই মার্ক্স ম্যালথাসের সমালোচনা করেছেন।

বর্তমানে চীনের মত সমাজতন্ত্রী দেশেও একথা স্বীকৃত যে তাদের জনসংখ্যা দেশের তুলনায় অত্যধিক হয়ে পড়েছে। তাই সে দেশে সরকার জনসংখ্যা রোধে নানান ব্যবস্থা নিয়ে চলেছেন।

ভারতে অনুসৃত জনসংখ্যা নীতি ঃ একটি সমাজতন্ত্রী দেশে জনসংখ্যা রোধে যেমন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছে ভারতে তা সম্ভব নয়। তবু আমাদের সরকার জনসংখ্যা রোধে যথাসাধ্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন। স্বাধীনতার আগে থেকেই আমাদের দেশের মনীষীরা এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার সময় থেকেই সরকার একে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। জন্মশাসন ও তার বিভিন্ন পদ্ধতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা নীতিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করার চেষ্টা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে সরকারী হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে। এখানে গ্রামের মানুষকে পরিবার পরিকল্পনার সুফলের কথা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা হয়। নির্বীজকরণ ও বন্ধ্যাকরণের ওপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোরও নতুন নতুন ব্যবস্থা হচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে আরো ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে ও শহরাঞ্চলে হাসপাতালের মধ্য দিয়ে। সাধারণ মানুষকে আরো বেশী মাত্রায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হয়। ১৯৬৬ সালে পরিবার পরিকল্পনার জন্য একটি আলাদা বিভাগ স্থাপন করা হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে। সেই সময় থেকেই 'লুপ'কে আরো জনপ্রিয় করার চেষ্টা হচ্ছে। জন্মনিরোধক (নিরোধ) প্রস্তুত করার জন্য সরকার নিজেই ব্যবস্থা নিচ্ছেন। বাল্যবিবাহও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জরুরী অবস্থার সময় পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে রূপায়িত করার চেষ্টা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কখনো কখনো সাধারণ মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হয়েছিল।

কিন্তু এতো চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের জনসংখ্যার বৃদ্ধি রোধের চেষ্টায় সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতাই বেশী। স্বাধীনতার সময় আমাদের দেশের লোকসংখ্যা ছিল ৩৪ কোটি। আজ, পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার তিন দশক অতিক্রান্ত হবার পরও আমাদের দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে ৩৪ কোটির অনেক বেশী মানুষ আছে।

আমাদের কর্তব্য ঃ একথা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের দেশে

খুব বেশী মাত্রায় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সুতরাং পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীকে আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। জন্মনিরোধ ও আরো অন্যান্য ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে ব্যবহার করতে হবে। অবশ্য এই ব্যাপারে জরুরী অবস্থার অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখে আমাদের সাবধানে এগোতে হবে। আমাদের দেশে সরকার পরিবার পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করার জন্য দম্পতিদের উৎসাহ দেন। তেমনি অধিকতর সন্তান উৎপাদনে মানুষকে নিরুৎসাহ করার কথাও ভাবা যেতে পারে। দরকার হলে এর জন্য কিছু নতুন আইন প্রবর্তন করা যেতে পারে। পরিবার পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করার জন্য সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি, চলচ্চিত্র ইত্যাদি জনসংযোগের মাধ্যমগুলিকে আরো বেশী ব্যবহার করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে নারীশিক্ষা ও নারীকে উন্নত সামাজিক মর্যাদায় স্থাপন করা দরকার, কারণ যে দেশে নারীরা অবহেলিত ও নীচু সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত তার পক্ষে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

আমরা মনে করি আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের সেরা উপায় হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে সম্পর্ক তার দুটি দিক আছে। জনসংখ্যার গতি যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে, অর্থনৈতিক উন্নয়নও তেমনি জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিকে কমিয়ে আনতে পারে। উন্নত জীবনযাত্রার স্বাদ মানুষ একবার যখন পায়, অল্পসংখ্যক সন্তান উৎপাদন করে সে সেই পর্যায়টা বজায় রাখার চেষ্টা করে।

আলোচনার শুরুতেই একথা বলা হয়েছে যে উন্নয়ন ও জনসংখ্যার সম্পর্কের চরিত্রটা ভিন্ন ভিন্ন দেশে আলাদা। উন্নত দেশগুলিতে জীবনযাত্রার উঁচু পর্যায়, পর্যাপ্ত খাদ্য, আবাসনের সুব্যবস্থা, দৈবদুর্যোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা ইত্যাদির সাহায্যে মৃত্যুহার বেশ নীচু। এই দেশগুলিতে শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution) ও স্বাস্থ্য বিপ্লব (Public Health Revolution) একই সময়ে ঘটেছিল। ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিটা রুদ্ধ হয়নি। পরে, উঁচু জীবনযাত্রার মানকে বজায় রাখতে সাধারণ মানুষ নিজে থেকেই জন্মহারকে কমিয়ে আনতে আগ্রহী হয়েছে, এবং জনসংখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই না-বৃদ্ধি না-হ্রাসের স্তরে এসে পৌঁচেছে। অনুন্নত দেশগুলিতে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে যদিও অর্থনৈতিক অবস্থা বিন্দুমাত্র উন্নত হচ্ছে না। তার কারণ এরা স্বাস্থ্যবিপ্লব ঘটাতে পারলেও শিল্পবিপ্লব ঘটাতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত যা ঘটছে তা হল জন্মহার একই থেকে যাচ্ছে কিন্তু মৃত্যুহার প্রচুর কমছে, যার ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। আমরা আশা করি যে একবার যদি আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারি তবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজটা আপনিই অনেক সহজসাধ্য হয়ে যাবে।

উন্নয়নশীল দেশগুলি তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যায়। প্রথম স্তরে জনসংখ্যার কোনো উল্লেখযোগ্য হ্রাস বা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়না, কারণ জন্মহার ও মৃত্যুহার দুইই থাকে খুব উঁচু। দ্বিতীয় স্তরে জন্মহার যদিও মোটামুটি একই থাকে মৃত্যুহার অনেক কমে যায়। এর কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যত অগ্রসর হয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে, আইনশৃঙ্খলা আরো সুপরিকল্পিতভাবে রক্ষা করা হয়, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সুব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়, ইত্যাদি। এই স্তরে লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। তৃতীয় স্তরে শিক্ষার প্রসার, উঁচুমানের জীবনযাত্রার ইচ্ছা মানুষকে প্রভাবিত করে জন্মহার কমিয়ে আনতে। জনসংখ্যাও এই স্তরে একটি না-বৃদ্ধি না-হ্রাসের অবস্থায় পৌঁছে যায়।

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের মতো ভারতবর্ষও এখন এই দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট করে এবং তার সঙ্ঘবদ্ধ রূপদানের মধ্য দিয়ে ভারতকে তৃতীয় স্তরে উন্নীত করতে হবে। এর জন্য পরিকল্পনা ব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ দিকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে, যেমন

১. অর্থনৈতিক উন্নয়নকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে দ্রুত করার চেষ্টা করা।

২. লভ্য সাধারণ সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখে তার সঠিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে যাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

৪ উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টাকে প্রাধান্য দেওয়া।

৫. গ্রামীণ অর্থনীতি যাতে দুর্বল হয়ে না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

৬. কৃষির উন্নতির চেষ্টা করা।

৭. সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা।

উপসংহার ঃ এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা লোকসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি, এবং দেখাতে চেষ্টা করেছি পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কেন এবং তা কিভাবে করা হচ্ছে। আমরা একথা মনে করি যে অর্থনৈতিক উন্নয়নই জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে আনার সেরা উপায়। আমাদের দেশে এটা হয়ত একটা সুদূর স্বপ্ন, তবে আমরা আশা করব যে সরকারের আন্তরিক প্রয়াস ও সাধারণ মানুষের সচেতনতার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছব।

আর্কিমিডিসের চাবি

পারমিতা রায়চৌধুরী

তিনপুরুষের পুরনো একটা চাবি। সামান্য জিনিস—দেখতেও সামান্য। অথচ সেই চাবি নিয়ে আমাদের বাড়ীতে মাতামাতির অন্ত নেই। সেই কোন যুগ থেকে চাবিটা আমাদের বাড়ীর সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। ওটা যেন কোনো অজানা গুপ্তধনের রহস্যময় চাবিকাঠি।

অনেক পুরনো একটা আলমারীর চাবি ওটা। শুনেছি বাবার ঠাকুর্দ্দার আমলে ওটা বাড়ীতে এসেছিল। কে জানে কেন বাবার কাকা-জ্যাঠাদের আলমারীর থেকে চাবিটাই মন কেড়েছিল বেশী। চাবিটা কিন্তু অসাধারণ কিছুই নয়।

আমরাও বড় হতে হতে চাবিটার প্রেমে পড়ে গেলাম ধীরে ধীরে। দেখতাম একবার চাবি হাতে পেলে কেউ ছাড়তে চায় না, যতক্ষণ পারে আগলে-আগলে রাখে। অনেক কৌশলে যদি বা আর কেউ তা অধিকার করতে পারে, তবু সেও নিশ্চিন্তে থাকতে পারে না। অনেক সময়ই দেখা যেত চাবি নিয়ে বাড়ীতে ভীষণ গণ্ডগোল লেগে গিয়েছে।

চাবি নিয়ে আমাদের মধ্যে যত কলহ বেড়ে উঠতে লাগল, আমরা আলমারীটার কথা ভুলে যেতে থাকলাম। আগেই বলেছি আলমারীটা এসেছিল সেই কবে কোন কালে, আমার ঠাকুর্দ্দা বোধহয় জন্মানই-নি তখন। বয়স যত বাড়তে থাকল দেখলাম চাবির প্রভাবে আমাদের বাবা-কাকা-জ্যাঠারা, মা-কাকীমা-জ্যেঠিমারা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।

একসময় আমিও বড় হলাম। উপরের সারির কয়েকজন বিদায় নিলেন, কয়েকজন থাকলেন। যাঁরা বৃদ্ধ হলেন তাঁদের কাছ থেকে চাবি ও চাবির প্রভাবের উত্তরাধিকারী হলাম আমরা—মানে যারা সদ্য বড় হয়েছি বা হচ্ছি। আমি বাড়ীতে সকলের ছোট—চাবি আমার হাতে এসেছে অনেক পরে।

আমাদের হাতে চাবি পড়ল বটে, কিন্তু এ প্রজন্মের চাঞ্চল্যে, ঔদ্ধত্যে ও অধৈর্য্যে। আমরা যে যার পথ দেখলাম। বিরাট পরিবারের দৃঢ় বন্ধন শিথিল হতে হতে আবিষ্কার করলাম যে বাড়ী প্রায় ফাঁকা হতে চলেছে। প্রথম আমার বড় বড় দাদারা দিদিরা একে একে চলে গেল। কেউ চাকরি নিয়ে, কেউ বিয়ে হয়ে, কেউ ভাগ্য অন্বেষণে, কেউ বা নিছক নতুনত্বের খোঁজে। এক সময়ে দেখলাম যে বাড়ীতে আমি একা, একদম একা, শুধু থাকবার মধ্যে পুরোনো আমলের কয়েকজন মালী চাকর ইত্যাদি, যাদের আর কোথাও নড়বার সাধ্য নেই।

নিজের একাকীত্বকে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম আমি। ঠিক এইটাই আমি এত দিন ধরে চাইছিলাম। অসংখ্য জনমানুষ একসঙ্গে ছিলাম আমরা—শেষে প্রায় সকলেই সকলের অপরিচিত হয়ে যাচ্ছিলাম। যেন ভীষণ ভীড় কোনো বাসের মধ্যে অনেক অপরিচিত মানুষ নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি, গালাগালি, লাথালাথি করছিলাম এতদিন। তার থেকে এই একাকীত্ব, এই নৈঃশব্দ্য ঢের সুখকর। বিশাল পুরীতে আমি একা—আমার নিজেকে মনে হচ্ছিল—'I am the monarch of all I survey'।

আমার নিজেকে সম্রাট মনে করার আরেকটা কারণও রয়েছে। দুই পুরুষের সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত চাবি এখন আমার হাতে। চাবি নিয়ে যে নিত্য গোলমাল চলত আমাদের, ভেবেছিলাম সেখান থেকে ওই চাবি করায়ত্ত করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া বাড়ীতে সবচেয়ে ছোট আমি—চাবি সম্পর্কে কোনো দাবি আমার কিছু পরেই আসার কথা। তাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যখন মেজদা যাবার সময়ে আমার হাতে চাবিটা নিজেই দিয়ে গেল। যাবার মধ্যে বাকী ছিল শুধু মেজদাই তখন। বাকীরা চলে গেছে অনেক আগেই। মেজদা অকৃতদার সন্ন্যাসী প্রকৃতির মানুষ,—চাবি নিয়ে তারই একমাত্র বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না দেখেছি। সেই মেজদার কাছে এই চাবি কেমন করে এল সবে ভাবতে শুরু করেছি—তখন সে নিজেই আমার চিন্তার নিরসন ঘটাল। বলল—দাদা যাবার আগে আমায় চাবিটা দিয়ে গেছে। বুঝলাম দাদা ভেবেছে মেজদার কাছে চাবি রাখা নিরাপদ তাই তাকেই দিয়েছে। নিজে কেন নিয়ে যায়নি তাই ভাবছিলাম। মেজদার কথাবার্তায় বুঝলাম অনন্ত আকাশচুম্বী হিমালয় ওকে আহ্বান করছে। আমি বাধা দিইনি। অবশ্য সত্যি বলতে কি, চাবিটা পেয়ে আমি এত আনন্দিত হয়েছিলাম যে আর কিছু তখন ভাবতেই পারছিলাম না। যে চাবিটার প্রতি লোভ আমার সেই ছোটবেলা থেকে, সে যে নিজেই এসে ধরা দেবে ভাবিনি।

তবু আমার একটা দুর্ভাবনা ছিলই। দাদা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময়ে এসে চাবিটা চাইবে। আমি অনেকবার ভাবলাম কী বলব তাকে। ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম—চাবিটার কথা আমি একেবারে অস্বীকার করব। আমি এই চাবি নিয়ে যত লুকোচুরি দেখেছি, আমার মনে হচ্ছিল এটুকু প্রতারণা তার কাছে কিছুই নয়। বরং আমার এই লুকোচুরি খেলায় একটা শিশুর মতো নিজস্ব আনন্দ হচ্ছিল।

শেষ বিকেলের রাঙা আলোয় দেখা হলো পিয়ার সঙ্গে। আমি কিন্তু আমার এই আনন্দটা তার সঙ্গেও ভাগ করে নিতে পারলাম না। তা শুধু আমার নিজস্ব —আর তার গোপনীয়তাটাই তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। পিয়া অবশ্য আন্দাজ করেছিলে কিছুটা। সে তার স্বভাবমতো কিছুই জিজ্ঞেস করেনি—না জেনেই আমার ছেলেমানুষী আনন্দটা কিছুটা উপভোগ করে নিচ্ছিল।

আমি চাবিটার সঙ্গ পেতে অভ্যস্ত হতে থাকলাম আস্তে আস্তে। প্রথম বিস্ময় ও আনন্দ কাটিয়ে আমি এখন ওটার সংরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। এমনই এক দিন—এক রোববার দুপুরে গাড়ীর হর্ণ শুনে আমার ঘুম ভাঙল। সবে কাঁচা ঘুম ভাঙার বিরক্তিটা অনুভব করব তখন আলস্যে চোখ কচলাতে কচলাতে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি দাদা, বৌদি আর ছেলেমেয়েরা নামছে। ভীষণ একটা ভয় আমায় চেপে ধরল আর আমি প্রাণপণে চেপে ধরলাম আমার গলার কাছটা যেখানে চাবিটা আমি চেন দিয়ে ঝুলিয়ে রাখি। প্রথমেই মনে হোল এটা লুকনো দরকার। তাড়াতাড়ি করে আমার আলমারীতে

চাবি বন্ধ করে আমি নিচে নেমে এলাম। একটু ধাতস্থ হয়ে ফ্রিজ থেকে একগাদা জল হাঁ করে খেয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দাদাদের এনে বসালাম বসার ঘরে।

আশ্চর্যের বিষয়—দাদা কিন্তু একবারও আমায় চাবির কথা জিজ্ঞেস করল না। মনে হোল আলাদা থাকতে থাকতে দাদার স্বভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে, বউদিও গোলগাল ভাব কমিয়ে এনে অনেক মানুষ হয়ে গেছে। এক সময়ে টের পেলাম আমিও বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে গল্প করছি—ভাইপো ভাইঝিদের নিয়ে খেলছি—পরের রোববার সিনেমা দেখার প্ল্যান করছি বউদিদির সঙ্গে। আমি তখনকার মত চাবির কথা ভুলে গেলাম। দাদার তো দেখলাম যে খেয়ালই নেই।

সারা সন্ধ্যে হৈ চৈ করে যখন ঘরে ফিরে এলাম তখন সমস্ত ঘরের বদ্ধ পরিবেশ আমায় ফের চাবিটার কথা মনে পড়িয়ে দিল। আমি তাড়াতাড়ি আলমারী খুলে চাবিটা বার করে তার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এই চাবিটা এত নোংরামির কারণ হয়েও আমায় আজ বাঁচিয়েছে প্রতারণা করার হাত থেকে। চাবিটার দিকে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময়ে মোহাবিষ্ট হয়ে আমি ওকে চুমু খেলাম। এত গভীরভাবে পিয়াকেও কোনোদিন চুমু খাইনি আমি।

চাবিটার বিষয় কেউ খোঁজ করল না, জোর জুলুম করে ওটা চাইতে এলো না এটা আমার পক্ষে এক নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাটা আমায় উৎফুল্ল তো করলই না বরং কেমন জানি বিমর্ষ করে তুলল। চাবিটার সঙ্গে যে উত্তেজনা এতদিন জড়িত ছিল সেটা নিস্তেজ হয়ে যাওয়াতে তার সম্বন্ধে আমার উৎসাহও কমে এলো। আমার উৎসাহের কারণ তখন পিয়া। পিয়াকে আমি বিয়ে করে আনলাম।

চাবির থেকে আমার মনে সরে গিয়েছিল। তাই পিয়া যখন আমার গলার কাছে চাবির অস্তিত্ব টের পেয়ে তার ইতিহাস জানতে চাইল—আমার বলার ভঙ্গিতে ক্লান্তি ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু অবাক হলাম পিয়ার উৎসাহ দেখে। সে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'একটা চাবি নিয়ে এত কাণ্ড। তাহলে না জানি কি আছে আলমারীটার ভিতর।

কিন্তু আলমারীটার কথা তো আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। ওটা ছিল কবেকার আলমারী—শেষ কে ওটায় কি রেখেছে ভগবান জানে। আমি পুরনো জিনিস পছন্দ করি না—আমার সব জিনিস আলাদা থাকে। এত বড় বাড়ীতে আলমারীটা কোথায় আছে কে জানে?

পিয়া কিন্তু এসব কিছু শুনলই না। জোর করে আমায় টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল। এই রাত্তিরবেলা—পিয়ার সঙ্গ ছেড়ে আলমারী খোঁজার কোনো মানেও হয় না মনে হচ্ছিল। কিন্তু নতুন বিয়ে করা বউয়ের ইচ্ছে—নাও করা যায় না। খুব অনিচ্ছে সত্ত্বেও পায়ে চটি গলিয়ে আমরা আলমারী খুঁজতে বেরোলাম। পিয়ার আগ্রহ আমায় অবাক করছিল।

একটু একটু করে বাড়ীর মধ্যে ঘুরছি আর আশ্চর্য লাগছে। এ বাড়ীর কোনায় কোনায় কত জিনিস ঢুকে পড়েছে। কিছু চেনা—আমাদের ছোটবেলায় দেখা বেশীর ভাগই অচেনা। অকেজো জিনিসের আবর্জনার স্তূপ দেখে আমার বিরক্ত লাগছিল—সব জঞ্জাল পরিষ্কার করাতে হবে অর্জুনকে দিয়ে। পিয়া কিন্তু মোটেই এসব কথা ভাবছিল না—ও বরং 'এটা কি সুন্দর', 'ওমা ওটার কথা বলনি তো' এইসব বলে আপন আনন্দে মেতেছিল। আর সমস্ত আলমারীতে চাবিটা ঢুকিয়ে পরীক্ষা করাচ্ছিল আমাকে দিয়ে—কারণ চাবিটা তখনও—আমার হাতে।

আর আশ্চর্য—সেই আলমারীটা আমরা পেয়েও গেলাম। একেবারে কোণের একটা ছোট ঘর—সেখানে আলো পর্যন্ত নেই—মোমবাতি জ্বালিয়ে খুব সাবধানে আমরা ভয়ে ভয়ে ঢুকেছিলাম। আর আলমারীটা একেবারেই সাধারণ—আমার পূর্বপুরুষদের অন্যান্য অনেক সম্পত্তির চেয়ে অনেক নিষ্প্রভ। তবু সেই আলমারীটাতেই টক্ করে চাবিটা লেগে যাওয়াতে পিয়া একটু নিরুৎসাহ হয়েছিল। মনের ভাব চেপে বলল, 'ইচ্ছে ক'রেই হয়ত—বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না যাতে।' আমি বুঝতে পারছিলাম ও কোনো অসাধারণ গুপ্তধনের কল্পনায় বিভোর।

আলমারীটা খুলতে আমার যেন এক সেকেণ্ড দেরী হয়েছিল। তবু খুললাম ঠিকই। আমার দেখার আগেই পিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাকে ডিঙিয়ে—প্রায় আলমারীটার

ভিতর। কিন্তু আমরা দুজনেই নিরাশ—ভিতরটা প্রায় ফাঁকা, দু-একটা বাজে কাগজ ছাড়া। কিন্তু না—পিয়া আবিষ্কার করেছে তলায় একটা বন্ধ ড্রয়ার রয়েছে—জ্বল-জ্বল করছিল তার মুখ—তার চোখ আমাকে কেন জানি না দাদুর কাছে গল্প শোনা সেই ক্ষুধার্ত বাঘিনীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

'কিন্তু এর তো চাবি নেই' আমি প্রায় অসহায়ভাবে বলি।

'নেই মানে কী—যে করেই হোক খুলতে হবে তো।' বলতে বলতে সে ছুটে গেল—এক নিমেষের মধ্যে কোত্থেকে জোগাড় করে আনল হাতুড়ী—একটা বিরাট পাথর এইসব। আর আমি, অন্ধকার ঘরে মোমবাতির আলোয় আমার পাঁচ বছরের চেনা পিয়াকে নতুন চেনা চিনছিলাম।

'কি দেখছ কি হাঁ করে—সাহায্য করবে তো একটু' বলে আমার হাত ধরে টেনে নেয় সে। আমি পাথরটা তুলে নিই হাতে। আস্তে আস্তে কি এক খোঁজার নেশা আমাকেও পেয়ে বসে .....এক জোড়া নরনারী ঘুমন্ত নগরীর অন্ধকারের, পরে অবিরাম আঘাত হানতে থাকে। শক্ত কাঠের দেরাজের গায়ে। অল্পক্ষণের মধ্যে সেটাও দুর্বল হয়ে খুলে আসে। পিয়া আর আমি অস্থিরভাবে হাতড়াতে থাকি ভিতরে। এক সময়ে মনে হয় হাতে কি যেন ঠেকল আমার। শব্দ শুনে পিয়া এক মুহূর্তও দেরী করে না—আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নেয় সেটা। উন্মত্তের মতো হাসতে থাকে 'পেয়েছি, পেয়েছি' বলতে বলতে।

বিংশ শতাব্দীর আর্কিমিডিসের হাতে দুলতে থাকে প্রায় একশ' বছর আগের একটা চাবি—অবিকল আগের-টার মতো দেখতে।

ইডেন হিন্দু হোস্টেলের ইতিকথা ঃ প্রথম পর্ব

প্রবোধ বিশ্বাস

এযুগে ছাত্রদের বসবাসের উদ্দেশ্যে বহু ছাত্রাবাস গড়ে উঠেছে, যদিও একথা অবশ্যস্বীকার্য যে প্রয়োজনের তুলনায় এর সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু আজ থেকে ১২০/১২৫ বছর আগেকার কলকাতায় যে সব ছাত্র মফস্বল বা আরও দূর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নগর কলকাতায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আসতেন তাঁদের যে কি বিষম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হ'ত তা সহজেই অনুমান করা চলে। সেকালে তো আর একালের মতো দ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই ছাত্রদের কলকাতাতেই থাকতে হত অথচ থাকার কোনো সর্বজনীন ব্যবস্থা ছিল না বললেই হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই ১৮৬২/৬৩ সাল নাগাদ লালবাজার স্ট্রীটের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু হোস্টেল। এর আগে কলকাতায় অন্য কোনো ছাত্রাবাস ছিল না বলেই জানা যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন সহকারী অধ্যাপক, 'বুক্‌স অফ্‌ রীডিং', 'লাইফ্‌ অফ্‌ ডেভিড্‌ হেয়ার' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা প্যারীচরণ সরকারের সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলেই হিন্দু হোস্টেলের জন্ম হয়। হোস্টেলের প্রাথমিক পর্বে বসবাসকারী ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ। বলা হয়ে থাকে যে, তৎকালীন সুপারিন্‌টেনডেন্ট ছিলেন যজ্ঞেশ্বর ঘোষ নামে এক ব্যক্তি এবং সে যুগের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাংলা গ্রন্থ প্রকাশক হোস্টেলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

বলা বাহুল্য, বহিরাগত ছাত্রদের জন্য একমাত্র হিন্দু হোস্টেলই যথেষ্ট ছিল না। ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যার কথা চিন্তা করেই ১৮৭৭ সালের অগস্টে Mr.

Woodrow-র পরামর্শ অনুসারে সরকার সিনেট হাউসের পশ্চিম দিকে হোস্টেল নির্মাণের জন্য দুই একর জমি দান করতে সম্মত হলেন। সর্ত রইলো যে বাড়ি তৈরির আনুমানিক ব্যয় ১,৪৭,০০০ টাকা ঐ উদ্দেশ্যে সংগৃহীত চাঁদা থেকেই মেটাতে হবে।

১৮৭৯ সালের ৬ই মার্চ তারিখে বাংলার তৎকালীন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর স্যার এস্‌লী ইডেনের [Sir Ashley Eden] সভাপতিত্বে ও কলকাতার কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির উপস্থিতিতে বেল্‌ভেডিয়ারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি হোস্টেল নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। "দ্য হিন্দু হোস্টেল বিল্ডিং ফাণ্ড কমিটি" নামে একটি কমিটি চাঁদা তোলার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়। এই কমিটিতে বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন, স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌, মিঃ আনন্দমোহন বসু, মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রায় কৃষ্টদাস পাল বাহাদুর, রায় ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিতবাহাদুর, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং মিঃ এ এম্‌ ন্যাস অবৈতনিক যুগ্মসম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন।

১৮৮২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ঐ কমিটি আনুমানিক ৫০,০০০ টাকা সংগ্রহ করে। কিন্তু ঐ টাকা সম্ভাব্য ব্যয়ের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর ছিল। ফলে সরকারের প্রতিশ্রুত জমিতে বাড়ি তোলার সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়ে পটলডাঙ্গার ঘোষাল পরিবারের বাড়িটি কেনার জন্য কমিটি নতুন করে আলোচনা শুরু করে আদায়ীকৃত ৫০,০০০ টাকা সহ জমির বদলে সরকারী আর্থিক সাহায্যের আশায়।

কয়েক বছর পরে, ১৮৮৬ সালে পুনশ্চ কলকাতার হিন্দু ছাত্রদের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণের প্রস্তাব নতুন করে উত্থাপিত হয় 'দ্য হিন্দু হোস্টেল বিল্ডিং ফাণ্ড' এর কার্যকরী সভায়। এখানে উল্লেখযোগ্য, ঐ কমিটি ইতিমধ্যে আদায়ীকৃত চাঁদার টাকায়, সরকার-প্রদত্ত ৪ বিঘা জমির উপরে ছাত্রাবাস-ভবনের একটি তল নির্মাণ করে ফেলেছেন। সরকার-প্রদত্ত ঐ জমিটিতে আগে একটি ছাপাখানা ছিল। ছাপাখানাটির নাম ছিল করিন্থিয়ান প্রেস। প্রথমে নির্মিত একতলা বাড়িটি এখনও 'ওল্ড বিল্ডিং' নামে পরিচিত এবং সরকারী ভাবে "এক নম্বর ওয়ার্ড" হিসাবে চিহ্নিত। এই বাড়ি নির্মাণের দানযজ্ঞে যে শুধু বাংলাদেশের ধনী সম্প্রদায়ই অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা নয়। অন্য প্রদেশের মুক্তহস্ত দানও এতে ছিল। যেমন, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজাও এর জন্য অর্থদান করেছিলেন। অনেক সাধারণ মানুষের দানও এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিল। হোস্টেল পরিচালনার দায়িত্ব ছিল একটি কমিটির উপর। সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, সি আই. ই ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। ১৮৮৭ সালে "ইডেন হিন্দু হোস্টেল"এর [হোস্টেল-পরিকল্পনাকারীর নামানুসারে] শিলান্যাস করেন ইডেনের উত্তরাধিকারী স্যার স্টুয়ার্ট বেইলী (Sir Steuart Bayley)। এই সময়ে জনসংযোগ অধিকর্তা ছিলেন স্যার অ্যালফ্রেড্‌ ক্রফট্‌ (Sir Alfred Croft)। *১৮৮৮ সালের একটি শীলমোহর থেকে জানা যাচ্ছে* যে এই হোস্টেলটি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান রূপে পরিচিত ছিল। শীলমোহরে লেখা ছিল, "গভঃ ইডেন হিন্দু হোস্টেল, ক্যালকাটা, ১৮৮৮"।

ধীরে ধীরে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ফলে স্থানসঙ্কুলানের জন্য অতিরিক্ত গৃহের প্রয়োজন দেখা দিল। ১৮৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহিষাদলের জমিদার বাবু জ্যোতিপ্রসাদ গর্গ হোস্টেলের দ্বিতল নির্মাণের জন্য ৩২,০০০টাকা দান করেন এবং ঐ বছরের শেষ নাগাদ বাড়ি তৈরির কাজ আরম্ভ করা হয়। সরকার বিনামূল্যে ৪,৭৫,০০০ ইঁট এবং ১০,০০০ কিউবিক ফুট সুরকী দ্বিতল গৃহ নির্মাণের জন্য দান করেন। বর্তমানে হোস্টেলের "দুই নম্বর ওয়ার্ড" নামাঙ্কিত অংশটি মহিষাদলের জমিদারের দান।

১৮৯১ সালে একটি ট্রাস্টের হাতে হোস্টেল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই ট্রাস্টের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজা দুর্গাচরণ লাহা (Law) প্রমুখ সম্মাননীয় ব্যক্তিগণ। রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। গোড়ার দিকে হোস্টেলের সমস্ত

আবাসিকই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিল না। অন্যান্য কলেজ এবং স্কুলের ছাত্ররাও এখানে বসবাস করত। হোস্টেল দেখাশোনার দায়িত্বে থাকতেন একজন সুপারিন্‌টেনডেণ্ট এবং সহকারী সুপারিন্‌টেনডেণ্ট। হোস্টেলের সীমানা এখনকার তুলনায় ছোট ছিল। এখন যেটি চিকিৎসার ঘর, রান্নাঘর এবং খাবার ঘর তা আগে হোস্টেলের চতুঃসীমার বহির্ভূত ছিল। হোস্টেলের সীমানার মধ্যে একটি মুদীর দোকান ছিল। বর্তমানে কর্মচারীদের বাসগৃহের ঠিক পূর্বদিকে ছিল তখনকার রান্নাঘর ও খাবার ঘর।

ইতিমধ্যে ছাত্রসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পুনশ্চ স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দিল। ১৮৯৫ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে শিক্ষা-অধিকর্তার একটি চিঠিতে [নং ২৪৬৭] জানানো হয় যে হোস্টেল নির্মাণের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে প্রেসিডেন্সি কলেজের হিন্দু ছাত্রদের জন্য। এই সূত্রে সরকারের সঙ্গে হোস্টেল ট্রাস্টীর আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সরকারের কাছেই হোস্টেল-পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় দুটি শর্তে ঃ ১) হোস্টেলটি হিন্দু ছাত্রদের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে। ২) সরকার হোস্টেলটির আর্থিক দায়িত্ব ৩০০০ টাকা পরিশোধ করে দেবেন। শিক্ষা-অধিকর্তাকে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র এবং সম্পত্তি-হস্তান্তর-সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবার মালিকানা দেওয়া হ'ল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, যে, বঙ্গীয় আইন পরিষদে নাটোরের মহারাজা কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল, যে, অন্য কলেজের ছাত্ররা, যাঁরা তৎকালে ইডেন হিন্দু হোস্টেলের আবাসিক তাঁদের পূর্বের মতোই বসবাসের অধিকার দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে হোস্টেলে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও তৎসংলগ্ন দুটি প্রবেশিকা স্কুলের ছাত্রদের দাবীকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৮৯৫ সালেই হাইকোর্টে হিন্দু হোস্টেলবাড়ি জমিসহ আইনগত হস্তান্তরের জন্য আদেশ চেয়ে একটি বিবরণী পেশ করা হয়। ১৮৯৬ সালের অক্টোবরে আইনগত সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'বার পর হোস্টেলের পূর্বদিকের দোতলা ব্লকটির নির্মাণকার্য শেষ হয় এবং ঐ বছরের জুন মাসেই এটি ব্যবহার যোগ্য করে তোলা হয়। পূর্বে উল্লিখিত মুদীর দোকানটি এবং ইঁট চূর্ণ করবার যন্ত্রটি তুলে দিয়ে সেই স্থানে বর্তমানের খাবার ঘর, হাসপাতাল এবং কর্মচারীদের বাসস্থান গড়ে তোলা হয়। পূর্বদিকে আরও একটি তিনতলা বাড়ি [যেটি পরবর্তী-কালে "নতুন বাড়ি" নামে পরিচিত] এই সময়েই নির্মিত হয়। এ সময়ে হোস্টেলে দুটি ব্লক ছিল—একটি দোতলা, অন্যটি তিনতলা। হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শিক্ষা-আধিকারিকের একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী বাবু কুঞ্জবিহারী বসু এম, এ। এ তথ্য জানা যায় হোস্টেলের গ্রন্থাগারে রক্ষিত Danver-এর "Portuguese in India" গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় ১৮৯৫ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে কুঞ্জবিহারী বসুর একটি স্বাক্ষর থেকে। ১৮৮৯ সালে, ফর্স্টরের "এসেজ্‌" [Forster's "Essays"] গ্রন্থে কুঞ্জবিহারীর আরো একটি স্বাক্ষর থেকে অনুমিত হয় যে, সম্ভবত হোস্টেলের জন্মলগ্ন থেকেই কুঞ্জবিহারী এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। নির্দ্বিধায় একথা বলা চলে যে, ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তিনি হোস্টেলের পরিচালনাকর্মে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এসময়ে তিনি শিক্ষা-অধিকর্তার ব্যক্তিগত সচিব রূপেও কাজ করেছিলেন। কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায়, পরবর্তীকালে, তিনি হোস্টেলের দায়িত্ব পরিত্যাগ করে, পুরোপুরিভাবে ব্যক্তিগত সচিবের কাজেই আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৯৭ সাল পর্যন্ত পূর্বোল্লিখিত কমিটির হাতেই হোস্টেল পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। শীঘ্রই সরকার স্বয়ং হোস্টেল পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করলেন। ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে হোস্টেল সরাসরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে এলো। তবে ১৯০০ সালের জানুয়ারী মাসের পূর্ব পর্যন্ত সরকার হোস্টেল পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯০০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত এই রূপান্তর-পর্যায়ে সরকার নিম্নলিখিত ব্যয়ভার নির্বাহ করেছেন :—

১। সুপার ও যুগ্ম-সুপার বাবদ—১,৮০০ টাকা।

২। মেডিক্যাল অফিসারের ভাতা বাবদ—
৬০০ টাকা।

৩। মিউনিসিপ্যালিটির খাজনা ইত্যাদি বাবদ—
৪০০ টাকা।

হোস্টেলের অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় সাময়িকভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত ফি' থেকে পরিশোধ করা হয়। ১৯০০ সালের নতুন ব্যবস্থা অনুসারে আবাসিক ছাত্রদের প্রদত্ত ফি'র টাকা সরকারী তহবিলে জমা পড়তো এবং এর বিনিময়ে সরকার হোস্টেলের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন।

বীরভূম জিলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় সুপারিন্‌টেনডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন এবং তিনি প্রায় তিন বছর এই দায়িত্বে বহাল থাকেন। তাঁর পরে মাত্র ছয়-সাত মাসের জন্য শিক্ষা-অধিকর্তার ব্যক্তিগত সহকারী বাবু অম্বিকাচরণ বসু অস্থায়ী সুপারিনটেনডেণ্টের কাজ চালান। পরবর্তীকালে হিন্দু স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাবু হরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় তিন বছর সুপারের দায়িত্বে ছিলেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, এম. এ প্রায় তিন বছর সুপারের কাজ পরিচালনা করেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর আমলে, হোস্টেলে ভর্তি-সংক্রান্ত ব্যাপারে দু' একটি পরিবর্তন ঘটে। ১৯০৫ সালে হিন্দু হোস্টেলের আসন শুধুমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়। বাবু হৃদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ, বি. এল, ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হোস্টেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় হোস্টেলের অনেক উন্নতি ঘটে। পূর্বসূরীদের আরব্ধ কাজ সুসম্পূর্ণ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, নিজেও অনেক মৌলিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে হোস্টেলের উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁরই প্রয়াসে, ১৯১২ সালে গ্যাসের আলোর বদলে হোস্টেলে বিজলী বাতির ব্যবস্থা চালু হয়।

১৮৯৮ সালের হোস্টেলটির সরকারী-অধিগ্রহণের পর থেকেই আবাসিকদের প্রতিমাসে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিতে হ'ত। একজন মেডিক্যাল অফিসার প্রতিদিন দু'বার করে এসে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যেতেন। উপরন্তু হোস্টেলের অভ্যন্তরে সংক্রামক রোগাক্রান্ত ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতালও ছিল। রান্নাঘর ও খাবার হলঘরটির দেখাশোনা করতেন অন্য একজন কর্মচারী। প্রতিদিনের আহার্য তালিকা বা 'মেনু' আবাসিকদের সঙ্গে আলোচনা করেই তৈরি করা হত। তাছাড়া মেস্ কমিটি প্রতিদিনের খাদ্য-তালিকা প্রস্তুতিতে সাহায্য করত।

খাদ্যবস্তুই সব নয়। মানসিক বিকাশের ব্যবস্থাও হোস্টেলে ছিল। কবিপ্রতিভা বিকাশের জন্য ছিল কবিসম্মিলনীর ব্যবস্থা। আবাসিকদের পড়াশুনার জন্য ছিল "হিন্দু হোস্টেল লাইব্রেরী ও রিডিং রুম"। ১৮৯৮ সালে [বাংলা ১৩০৫ সন] 'কবিসম্মিলনী'র প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়। সম্মিলনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মধ্যে 'সনেট' বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় উৎসাহদান। পরে অবশ্য বিশেষভাবে 'চতুর্দশপদী' রচনার কড়াকাড়ি শিথিল করে যে-কোনো কাব্যশিল্প সৃষ্টিতেই উৎসাহ দেওয়া হয়। সাত বছর ধরে "কবিসম্মিলনী"র কাজকর্ম ভালোভাবেই চলেছিল। অবশ্য মাঝখানে কিছুদিন তা বন্ধ ছিল। কিন্তু পরে তা আবার নতুন করে শুরু হয়।

বাংলার রেনেসাঁস—
বাস্তব বা অতিকথা

শ্রবসী ঘোষ

গ্রামকেন্দ্রিক স্বনির্ভরতা, জাতিবর্ণকুলগত স্থিতাবস্থা এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রতি ঔদাস্য নিয়ে ভারতবর্ষের সমাজ চলছিল তার নির্দিষ্ট ছন্দে যতক্ষণ না ইংরেজ বণিক ভারতবর্ষের শাসনভার হাতে তুলে নেয়। "All the civil wars, invasions, revolutions, conquests, famines, strangely complex, rapid and destructive as the successive action in Hindustan may appear, did not go deeper than its surface. England has broken down the entire frame-work of Indian society."(১) ভারতে ইংরেজ উপনিবেশের ফলাফল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত সত্ত্বেও একটি বিষয় বহুদিন অবধি সকল ঐতিহাসিকই একবাক্যে মেনে নিয়েছিলেন। "The period (1757–1858) witnessed . a radical transformation in her social and religious ideas...This great change affected at first only a small group of persons but...ultimately their influence reached...even the masses."(২) এই 'বিরাট পরিবর্তন' কে অনেকেই 'রেনেসাঁস' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতানুসারে ইংরেজ রাজত্বের ফলে এ দেশের আধুনিকতার সূচনা, ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে ভারতীয়দের চিন্তাধারায় যুক্তিবাদের উন্মেষ, রেলপথ-টেলিফোন-টেলিগ্রাফের মাধ্যমে এদেশে বিজ্ঞানের বিস্তার এবং সর্বোপরি এই প্রাগ্রসরতার পরমপ্রাপ্তি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব।

এই ঐতিহাসিকদের আমরা প্রধানতঃ দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করতে পারি। ইংরেজের পদাঙ্কানুসারী প্রথম গোষ্ঠী ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কথাই অন্ধভাবে মেনে নিয়েছেন। আর দ্বিতীয় গোষ্ঠী ভারতবর্ষের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন মার্কসের-এর একটি উক্তি ধ্রুবসত্য ধরে নিয়ে। "The work of regeneration hardly transpires through a heap of ruins. Nevertheless it has begun."(৩) কিন্তু 'ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক মানুষ' রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতাব্দীকাল পরেও ভারতবর্ষের চেহারা দেখে বর্তমান সমাজতাত্ত্বিকদের মনে প্রশ্ন উঠেছে যে বহু আলোচিত এই পরিবর্তনকে 'রেনেসাঁস' নাম দেওয়া কতটা সঙ্গত!

'রেনেসাঁস' কথাটি প্রযুক্ত হয় ইউরোপীয় সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন প্রসঙ্গে যখন মধ্যযুগের ধর্মীয় সংস্কার ও গতানুগতিকতাকে মানুষ সজ্ঞানে প্রথম আঘাত হানল। ইউরোপে রেনেসাঁসের সূচনা ইতালীতে চতুর্দশ শতকে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের মধ্যেই তা ব্যাপ্ত হয়েছিল অন্যান্য দেশেও। রেনেসাঁসের প্রধান লক্ষণ সাংস্কৃতিক বিপ্লব (বিপ্লব = আমূল পরিবর্তন)। পার্থিব জগৎ এবং প্রকৃতির সন্তান দোষগুণ সম্পন্ন 'Many-Sided Man' সম্পর্কে সাধারণ মানসিকতার পরিবর্তন দেখা দিল সমসাময়িক সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন ও বিজ্ঞানসাধনা প্রভৃতিতে। জ্ঞান চর্চার নতুন ধারা বইল দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী প্রবাহে। একদিকে চলল সুপ্রাচীন অতীতকে পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা; অন্যধারাটি এগিয়ে গেল আবিষ্কারের পথে। মধ্যযুগে শিক্ষার প্রচলন থাকলেও চার্চে ধর্মপ্রচারক সম্প্রদায় ও

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অভিজাত বংশীয় ব্যতীত সাধারণ্যে তার প্রসার ছিল না। উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষণ ছিল স্থানীয় ভাষার পরিবর্তে প্রাচীন, মৃত ল্যাটিনের অনুশীলন। সমাজের দৃষ্টির সম্মুখে ছিল ধর্মীয় সংস্কারের অনচ্ছ আবরণ।

রেনেসাঁসের সময়েই প্রথম ল্যাটিন থেকে স্থানীয় ভাষায় ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সূচনা। ক্ল্যাসিক্যাল ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্যের প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ইউরোপের স্থানীয় ভাষাগুলি। চিন্তামূলক প্রবন্ধসাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। চার্চের প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকে যা পরে 'Reformation'-এ সহায়তা করে। এই উদারতার প্রতিফলন ঘটে দান্তে, পেত্রার্ক প্রভৃতির কাব্যে, মাইকেল এঞ্জেলোর অসাধারণ শিল্পকর্মে ও লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, বতিচেল্লী, র‍্যাফেল, তিনতরেত্তোর চিত্রে। অবশ্য আধুনিক অর্থে বিজ্ঞান চর্চার সূচনা হল আরো প্রায় এক শতক পরে। রেনেসাঁসের সময় হতে ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে আধুনিক যুক্তিবাদের শুরু। এবং তার পর থেকে ইউরোপকে আর কখনো পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

উনবিংশ শতকে ইংরেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতে যে আলোড়ন দেখা দেয়, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গেই তুলনীয়। সমসাময়িক ভারতবর্ষের তুলনায় নিঃসন্দেহে উন্নততর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এক শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে যুক্তিবাদ, শিক্ষায় আগ্রহ, নারীনির্যাতনের প্রতিবাদ, স্বচ্ছ ধর্মচেতনা, সাহিত্যবৃত্তি প্রভৃতির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ ও পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রূপান্তরিত ব্রাহ্মধর্ম ছিল তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুত্ব ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য এদেশবাসীদের আগ্রহে, মিশনারীগণ ও ইংরেজ সরকারের সাহায্যে স্থাপিত হয় বহু বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, একটি মেডিকেল কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। হেনরী লুই ডিরোজিওর প্রভাবে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মধ্যে যুক্তি বিচার ও কঠোর বিদ্যানুশীলনের পরিচয় মেলে। মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ বহুবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন ও নারীশিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতিরা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। এই নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ফসল রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বিশ্বখ্যাত শিল্পীবৃন্দ। স্বদেশী চেতনা ও স্বনির্ভরতাকে মর্যাদা দিতে রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র প্রমুখ শুরু করেন 'হিন্দুমেলা'। প্রধানতঃ ঠাকুর পরিবারে কিছু স্বদেশী শিল্পোদ্যোগও লক্ষ্য করা যায়। ক্রমে দেশীয় বাংলা ও ইংরেজীতে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যেমন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, Hindu Patriot, অমৃত বাজার পত্রিকা প্রভৃতি। ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের কথাও, যেমন নীলকরদের কাহিনী, এই সকল পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এই পরিবেশের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, বিপিন পাল ও পরবর্তী যুগের কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ। সমসময়ে এদেশে আধুনিক বিজ্ঞানের সুবিধা প্রথম অনুভব করে ইংরেজপ্রবর্তিত রেলপথ, বিদ্যুৎব্যবস্থা, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, যন্ত্রযান প্রভৃতির মাধ্যমে। এগুলির দ্বারা ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন সাজাত্য বোধ জাতীয়তায় পরিণত হবার সুযোগ পায়।

কিন্তু এখানেই কি রেনেসাঁসের শেষ কথা? সাংস্কৃতিক পরিবর্তন রেনেসাঁসের প্রধানতম লক্ষণ হলেও নিঃসন্দেহে তার একমাত্র লক্ষণ নয়। "The typological importance of the Renaissance is that it marks the first cultural *and social* breach between the Middle Ages and modern times : it is a typical early stage of modern age." (৪) সমাজে ব্যক্তিমানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। সংস্কৃতির উদ্ভব হয় সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদের ওপর। কখনো কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন স্থায়ী ও বহুব্যাপ্ত হতে পারে না, যদি সে পরিবর্তন অর্থনৈতিক

বিপ্লবের সূচনা না করতে পারে। ইউরোপের রেনেসাঁস শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক উত্থান রূপে না থেকে সমাজের প্রতি রন্ধ্রে ব্যাপ্ত হয়েছিল তার চালিকাশক্তি বণিক শাসনতন্ত্রের উদ্ভবের ফলে।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে সমাজের স্থাবর রূপ ফুটে ওঠে অনড় অচল 'pyramid of Estates' এবং তার পাশাপাশি 'pyramid of values' এর মধ্যে। সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পিরামিডের ঊর্ধ্বতম বিন্দুতে অধিষ্ঠিত ছিলেন সম্রাট ; তাঁর খাস জমি ব্যতীত সবটাই ছিল বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন 'Manor Lord' এর মাধ্যমে ভূমিদাস কৃষকদের হাতে কর্ষণের জন্য বিতরিত। রাজস্ব ছিল রাজার জমি ব্যবহারের জন্য দেয় ভাড়া। কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে অবাধ ব্যবসা ছিল উপেক্ষিত, মুদ্রা অপ্রচলিত। গ্রামের হাটে স্থানীয়-ভাবে কিছু কিছু বাণিজ্য চলত বিনিময় প্রথায়। সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল অভিজাত সম্প্রদায় ও চার্চের হাতে। মধ্যযুগীয় নগর ছিল শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্র, গ্রামের সঙ্গে তার চরিত্রগত পার্থক্য খুব বেশী ছিল না। একমাত্র ইতালীর অর্থনৈতিক চিত্র ছিল কিছুটা অন্যরকম। পূর্বদেশ থেকে মূল্যবান্ তৈজসপত্র পশ্চিমের অভিজাত শ্রেণীর নিকট বিক্রয় করার পক্ষে ইতালীর অবস্থানগত আনুকূল্য জেনোয়া, ভেনিস, পিসা প্রভৃতিকে বাণিজ্যিক শহরের রূপ দিতে সক্ষম হয়। তবে সমগ্র ইউরোপের অর্থনীতিতে এই সব বিচ্ছিন্ন শহর রাজ্যের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে রেনেসাঁসের প্রারম্ভে।

রাজার কোনো বেতনভোগী সেনাবাহিনী ছিল না। ভূমিস্বত্বভোগী মাত্রেই বাধ্য ছিল যুদ্ধের সময়ে রাজাকে সৈন্যসাহায্য দিতে। মধ্যযুগের শেষের দিকে মুসলমান আরবরা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করতে শুরু করে। খ্রীস্টান চার্চ ও রাজাদের সঙ্গে এই সময়ে প্রায়শঃই তাদের সংঘাত বাধে, যাকে চার্চ 'Crusade' (?) নামে অভিহিত করে। এই সকল যুদ্ধের পেছনে ছিল Roman church ও Byzantine church এর সম্মিলিত ক্ষমতা বিস্তা-রের ইচ্ছা। আরো ছিল প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যপথ আরব দখলমুক্ত করার জন্য ইউরোপের সামগ্রিক প্রচেষ্টা। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ সামন্ততন্ত্রে এক বিশাল পরিবর্তনের সূচনা করে। যুদ্ধের সময়ে বিপুল সেনাবাহিনীকে ইতালীয় ব্যবসায়ীরা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় "for the love of God" কিন্তু তার সঙ্গে লুঠের বখরাও তাদের প্রাপ্য ছিল। সৈন্য-বাহিনীর আবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্যই ইউরোপে বণিক শ্রেণীর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। অবাধ বাণিজ্যের সাথে মুদ্রা প্রচলিত হয়। ক্রমশঃ বণিকশ্রেণী অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে রাজার উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। অভিজাত সম্প্রদায় ও চার্চের প্রভাবমুক্ত বাণিজ্যকেন্দ্রিক শহরের জন্ম হয়।

বাণিজ্যের প্রয়োজনে, বিভিন্ন খাতে অর্থকে আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য বণিকেরা নতুন নতুন পথে এগিয়ে চলল ; বাড়ল জ্ঞান সাধনা, বিজ্ঞানচর্চা। ব্যবসার অগ্রগতির জন্য বণিকেরা সামন্ত ও ধর্মতন্ত্রের প্রাধান্য অস্বীকার করল। বাণিজ্যিক শহরগুলি মানুষকে মুক্তির সন্ধান দিল। স্থাবর 'pyramid of Estates' কে আঘাত দিল অবাধ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার নীতি ও সচল মুদ্রা। ফলে সমাজে এক নতুন গতিশীল স্তরায়ন শুরু হল। "Cash payments are now the tie between people."(৫) অবাধগতি টাকার দৌলতে সামাজিক মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তি সবকিছুই ঊর্ধ্বাধঃ গতিশীলতা লাভ করল। রেনেসাঁসের যুগে Aeneas Sylvius বলেন, "Italy···has lost all stability···a servant may easily become a king."(৬)। রেনেসাঁস স্থায়িত্ব লাভ করেছিল উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক অধিকার বণিকশ্রেণীর হস্তগত হওয়ায়।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের আপাত-ঔজ্জ্বল্যের আড়ালে কিন্তু আমরা অন্য চিত্র দেখি। বিনয় ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন, "পণ্ডিতেরা উনিশ শতকে বাংলার যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কথা বলেন, সেটা কি পদার্থ? কোথায় এবং কখন 'জাগরণ' হল? জাগল কারা?"(৭) এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে প্রচলিত ইতিহাসের ব্যাখ্যা এড়িয়ে আমাদের অন্যদিকে তাকাতে হবে। দেখতে হবে রেনেসাঁসের ধারক ও

বাহক অর্থনৈতিক কাঠামো কতটা পাল্টেছে। "A real renaissance affects and improves many aspects of human life and must in the first instance be capable of being measured in terms of real improvement in agriculture and commodity production;"(৮) পাশ্চাত্য সমাজে যেমন Mercantile capitalism এর বিকাশ ও তার পরিণতি Industrial capitalism এ। সে দিক দিয়েই বা ভারতের রেনেসাঁস কতটা সার্থক তা বিচার্য।

ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিনির্ভর। মুঘল যুগেও তার অন্যথা ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেমন, শাসকগোষ্ঠী ছিল বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। কিন্তু 'আইন-ই-আকবরী' থেকে জানা যায় জমির মালিকানা ছিল কৃষকদের, যারা জমিতে ফসল ফলাতো। আবুল ফজলের মতে সম্রাট কর হিসেবে সামাজিক সম্পদের যে 'উদ্বৃত্ত' অংশ পেতেন তা ছিল সার্বভৌমত্ব ও উচ্চতর সামরিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় মূল্য। 'জমিতে ব্যক্তিগতভাবে কৃষকের চিরস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক দখলীস্বত্ব স্বীকৃত ছিল। যদিও মুঘল আমলে বিভিন্ন খাতে শোষণের অন্ত ছিল না, তবু জমির মালিকানা কৃষকদের হাতে থাকায় স্বনির্ভর গ্রামগুলির অর্থনীতি কখনো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েনি। সমকালীন ইউরোপের চেয়ে এদেশে কারুশিল্প-বাণিজ্য ও মুদ্রার ব্যবহার বেশী ছিল।

ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকেই বাংলাদেশে বহুরকম পরিবর্তন ঘটেছে। তার মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণয়ন। বাংলাদেশে ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিকাশপথে এটি একটি বৃহৎ পদক্ষেপ। এই প্রথম জমিদার শ্রেণী জমির অধিকার হাতে পেল। জমিতে কৃষকের মালিকানা অস্বীকৃত হল। ইংরেজ এদেশে এসেছিল বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে, রাজ্যস্থাপনের নয়। এ দেশের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে তাই লুণ্ঠনের সুবিধার জন্য ইংরেজ এক অভিনব ঔপনিবেশিক ধণিক-সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ঘটাল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে, নির্দিষ্ট দিনক্ষণে রাজস্ব জমা দিতে অনভ্যস্ত বনেদী জমিদারদের জমি নীলাম হয়ে গেল; পরিবর্তে যাঁরা ভূস্বামী হয়ে বসলেন তাঁরা ব্রিটিশের বেতনভোগী কর্মচারী। ইংরেজ বণিকের অধীনে কর্মরত মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, দালাল প্রভৃতিদের হাতে সৎ বা অসৎ উপায়ে অর্জিত প্রচুর কাঁচা টাকা জমা হয়েছিল। ধনতন্ত্রের উন্মেষপর্বে এই সচল টাকাই Mercantile capital এর রূপ নিতে পারত। কিন্তু এ দেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা ছিল ব্রিটিশ শাসক-স্বার্থের পরিপন্থী। ৬ই মার্চ, ১৭৯৩ তারিখের এক চিঠিতে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে লিখেছেন, "The large capitals possessed by many of the natives, which they will have *no means* of employing.....will be applied to the purchase of the landed property as soon as the tenure is declared to be secured."(৯) ইংরেজসৃষ্ট এই নব্যধনিক জমিদারশ্রেণী হয়ে দাঁড়াল ইংরেজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ইংরেজ শাসনের প্রধান স্তম্ভ।

ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই ভারতবর্ষের অচল 'pyramid of Estates' এ আঘাত হানল সচল টাকা। "টাকার সচলতার দিক থেকে বিচার করলে ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে, প্রধানত নতুন মহানগর কলকাতা কেন্দ্রে, আঠার শতক থেকে এই ধরণের (রেনেসাঁসের উপযোগী) পরিবেশ রচিত হয়েছিল। .....করিতকর্মা বাঙালীদের স্বাধীনতা ছিল ইংরেজদের অধীনে ও সাহচর্যে যে কোনো (অর্থকরী) কর্মে নিযুক্ত হবার ...। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বণিকদের মধ্যে অনেকেই কুলবৃত্তি ও কুলমর্যাদা ত্যাগ করে, নতুন টাকার মর্যাদায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।"(১০) কিন্তু সে টাকা চাকুরীলব্ধ, বাণিজ্যে অর্জিত নয়। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের 'pyramid of values' এর বিরাট পার্থক্য ছিল এদেশের জাতিভেদ প্রথার মধ্যে। "বিশেষ করে বাঙালী সমাজে বণিকশ্রেণীর

প্রতি সামাজিক উপেক্ষা"(১১) এদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ রুদ্ধ করেছে। এখানে আর একটি কথা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজ শাসক চায়নি দেশী বণিকতন্ত্রের উদ্ভব। যখনই দেশীয় উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর পক্ষপাতিত্বে বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে পরাস্ত হয়েছে। ইউরোপের বণিকশ্রেণীর মত কোনোরকম সংহত শক্তি এদেশের ব্যবসায়ীদের পক্ষে গঠন করা সম্ভব ছিল না। শিল্পোদ্যোগে নিরাপত্তার অভাবে এদেশের নব্য ধনিকশ্রেণীও সে পথে অগ্রসর হয়নি।

একমাত্র ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ই এদেশে কিছু শিল্পকেন্দ্র, রেলপথ, খনিজ উত্তোলন প্রভৃতির প্রবর্তন করে; সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে নয়, শোষণের সুবিধার্থে। সমাজবিজ্ঞানীরা আশা করেছিলেন এর ফলে ধীরে ধীরে এদেশে শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা হবে। "The railway system will therefore become, in India, truly the forerunner of modern industry."(১২)। কিন্তু কয়েকটি নির্দিষ্ট মাত্র স্থানে কারখানা স্থাপনের জন্য সমগ্র দেশে তার কোনো প্রভাবই পরেনি। এগুলি যেন ক্ষুদ্র enclave, "cut out and isolated from the surrounding economy, but tied to the economy of the home country."(১৩) ভারতবর্ষ এই সকল শিল্পোদ্যোগে স্বল্প মজুরিতে প্রচুর শ্রমিক সরবরাহ করেছে, মূলধন বা কারিগরিবিদ্যা কোনো কিছুই প্রয়োগ করতে পারেনি।

প্রকৃত অর্থে রেনেসাঁসের অন্যতম লক্ষণ সমাজে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক বনিয়াদের উন্নয়ন। ঔপনিবেশিক ভারতে আমরা দেখি শুধুমাত্র ভাঙ্গনের চিহ্ন। মুঘল যুগে কৃষকের সংখ্যা অনুপাতে কৃষিভূমির পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। তার দুই শতকের মধ্যেই আমরা দেখি ভূমিহীন কৃষকরা স্বল্প মজুরিতে নতুন কারখানায় কর্মগ্রহণ করছে। এই অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের দায়িত্ব নতুন ভূস্বামীরাও অস্বীকার করতে পারে না। এরা বাস করত কলকাতায়। জমিদারীর রাজস্ব ব্যয় হত মহানগরেই, তার কিয়দংশও গ্রামে ফিরে যেত না। এরা কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে অকারণ conspicuous consumption এ; যে টাকা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে দেশীয় শিল্পোদ্যোগে লগ্নী করা যেত। "It was this class of proprietors, enriched by the plunder of millions of poor peasants, who brought about a cultural resurgence in the city..... This resurgence has often been mistakenly called the Indian renaissance, often fondly so by the class which were its beneficiaries. This so called renaissance bore the indelible stamp of the class among whom it was noticed...The country at large practically did not exist for this renaissance."(১৪) রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, 'ইয়ং বেঙ্গল' এর সদস্যরা বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এমনকি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সকলেই ছিলেন এই নব্যধনিক ও অনুপস্থিত ভূস্বামী শ্রেণীভুক্ত। এদের পাশাপাশি তৈরী হয়েছিল শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ইংরেজদের অধীনে করণিক বৃত্তি যাদের জীবনের লক্ষ্য। ইংরেজী শিক্ষা লাভে উন্মুখ এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কাজ করেছিল ইংরেজ প্রভুকে অনুকরণের প্রবৃত্তি। নিজের দেশের ঐতিহ্য এদের কাছে ছিল অসমীহকর। সংস্কৃত, ফারসী প্রভৃতি দেশীয় শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে রামমোহন রায় বলেছিলেন, "The pupils will...acquire what was known two thousand years age, with the addition of vain and empty subtleties."(১৫) অথচ ইউরোপীয় রেনেসাঁসে আমরা দেখি নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পুঁথিপত্রের প্রতি আগ্রহও বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশীয় শিক্ষার প্রতি সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর অনাগ্রহ গ্রামে গঞ্জে শিক্ষাবিস্তারে বাধাই দিয়েছে, ইংরেজী শিক্ষার পথ সুগম করেনি। পাশ্চাত্যের প্রভাবে সমগ্র দেশের সঙ্গে এদের যোগসূত্র

ক্ষীণতর হতে হতে শেষে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। জাঁ পল সার্ত্রের ভাষায়, "The European elite undertook to manufacture a native elite...(They) had nothing left to say to their brothers; they only echoed."(১৬) সুতরাং আমরা দেখছি, এমনকি যাকে অশোক মিত্র 'cultural resurgence' বলেছেন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গেও তার পার্থক্য চরিত্রগত।

নির্দেশিকা :

১। Karl Marx, 'The British Rule in India,' 1853.
২। R. C. Majumder ,H. C. Raychaudhuri & K. Datta, *An Advanced History of India,* 1981.
৩। Karl Marx, 'The Further Results of the British Rule in India' ; 1853.
৪। Alfred von Martin, *Sociology of the Renaissance,* 1945.
৫। Lujo Brentano ; বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, ১৯৭৯ দ্রষ্টব্য।
৬। তদেব
৭। তদেব
৮। Asok Mitra, 'Fifteen Decades of Agrarian changes in Bengal', *Essays in Honour of Prof S. C. Sarkar,* 1976.
৯। বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, ১৯৭৯ দ্রঃ।
১০। তদেব
১১। তদেব
১২। Karl Marx, 'The Future Results of the British Rule in India, 1853.
১৩। বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, ১৯৭৯ দ্রঃ।
১৪। Asok Mitra, 'Fifteen Decades of Agrarian changes in Bengal', *Essays in Honour of Prof S C Sarkar,* 1976.
১৫। See, R. C. Majumdar, et al, *An Advanced History of India,* 1981.
১৬। See, preface, F. Fanon, *The Wretched of the Earth.*

এ ছাড়াও যে সব বই ও প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১। Leo Huberman, 'Man's Worldly Goods'.
২। 'The Renaissance : Six Essays,' Harper Torchbook edition,
৩। Amit Sen, 'Notes on Bengal Renaissance'.

বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়—হায়! ...বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নইলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। ...বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক...জীবনচরিত মাত্র। ...কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। ...মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বঙ্গদর্শন, ১২৮৭)

ফিরে আসা

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ হাঁচলেন। হাঁচির পূর্বাভাস পাওয়ামাত্র তাঁর পরিশীলিত মন হাতকে নির্দেশ দিয়েছিল কোটের পকেটে ঢুকতে, সেখানে হাত দিয়ে তিনি অবাক হলেন। বোধহয় তাঁর বিনা অনুমতিতে কোনো অধস্তন কর্মচারী তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেও তিনি এতটা অবাক হতেন না। তাঁর পকেটে রুমাল নেই। তিনি বিব্রত হলেন।

কাছেই অবশ্য টিস্যু পেপার ছিল, তাই দিয়ে নাক মুছলেন। সামনে বসে থাকা দুই ভদ্রলোকের চোখ হঠাৎই কাঠের প্যানেলিং করা দেওয়ালে রেমব্রাণ্টের একটা নিখুঁত কপির দিকে চলে গেল। চোখের তারিফ করতে হয়।

এক্সকিউজ্‌ মি জেন্টেলমেন, বলে সোমপ্রকাশ পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। কিন্তু মনে একটা কাঁটা খচখচ করে বিঁধতে লাগল।

লোক দুটি চলে যেতে নিজের পোষাক আবার তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। গত কুড়ি বছরে সাধন এরকম ভুল করেছে বলে তাঁর মনে পড়েনা। প্রতিদিন তাঁর কোটের বাঁদিকের পকেটে সাদা দুটো রুমাল রেখে দেয় সাধন। আজ কি তবে ছোটবাবু আসার আনন্দে……। নাঃ! হি ইস গেটিং সিনাইল—বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।

কাঁচের জানলার সামনে দাঁড়ালেন সোমপ্রকাশ। নীচে লন, খানিক পরে উঁচু দেওয়াল। লাল রঙ করা। সোমপ্রকাশের ঘরের ঘড়ি টিক টিক শব্দ করে না, ইলেকট্রনিক ঘড়ি—সেকেণ্ডের লাল বিন্দু দুটো দপ, দপ করে জ্বলে নেভে: হার্টে যেন রক্ত পাম্প করা হচ্ছে। এখন দশটা পাঁচ। সূর্যর ফ্লাইট পাঁচ মিনিট হল এসেছে। ওরা সবাই গেছে ওকে আনতে, স্বাগত জানাতে—ওরা বলতে সূর্যর মা, বোন, বন্ধুরা।

টেবিলে ফিরে এলেন—দশটা আট, ডান দিকের ড্রয়ারটা খুললেন। সামনে পড়ে থাকা টেলিগ্রামটার ভাঁজ খুললেন। কালো টাইপের অক্ষরে ছোট্ট তিনটে শব্দ—'রিটার্ণিং সাকসেসফুল—সূর্য'। অক্ষরগুলো পিয়ানোর কি-বোর্ডের এবনির মত কালো। যেন এক সারি কালো দাঁত হাসছে। হাসিতে বিদ্রূপ না অহঙ্কার মেশানো ঠিক অনুধাবন করতে পারছেন না সোমপ্রকাশ। হাতটা মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছিল ক্রমশ, কুঁকড়ে যাচ্ছিল অক্ষরগুলো। তারপর কি মনে হতে আলগা করলেন। দুহাতে টেলিগ্রামটা সোজা করলেন, আবার ঢুকিয়ে রাখলেন ড্রয়ারে—সযত্নে। রক্ত পাম্প হচ্ছে হৃদয়ে—দশটা পনেরো।

ডেসপ্যাচ থেকে চৌধুরীকে ডেকে দাও তো। ইণ্টারকমের লাইন টিপলেন। ওপার থেকে ব্যস্ত নারীকণ্ঠ, ইয়েস স্যার। একটু ভেতরে আসুন—লাইন কাটলেন—দপ, দপ, দশটা তিরিশ।

সূর্যর মা অনেক করে বলেছিলেন, কি হবে পুরোনো রাগ পুষে রেখে, ও তখন ইমম্যাচিওর ছিল।

সূর্যর বোন বলেছিল—বাপী, বি এ স্পোর্ট। সোমপ্রকাশ কোনোকালেই খেলোয়াড়-সুলভ মনোভাবের পরিচয় দেননি। প্রয়োজন হয়নি। উনি জানতেন কেউ হেরে গেলে তাকে এসব বলে সান্ত্বনা দেওয়া হয়—ওঁর মতে, ঠাট্টা করা হয়।

উনি ইচ্ছে করেই যাননি। সূর্যর কি প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখার জন্যই যাননি। তাঁর এখনও স্পষ্ট মনে আছে সেই দিনের কথা। ডাইনিং টেবিলের বাকবিতণ্ডা। সূর্যর কণ্ঠস্বর আস্তে আস্তে চড়ায় উঠছিল, ভদ্রতার সীমারেখা বোধহয় লঙ্ঘন করছিল। সোমপ্রকাশ কিন্তু প্লেটের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। তবু সহ্যের পরীক্ষা দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছিল। কেউ তাঁর ওপরে চেঁচাবে তাতে তিনি অভ্যস্ত নন। তাই অকস্মাৎ

তিনি ছু'ড়ে দিয়েছিলেন সেই চ্যালেঞ্জ—আমি দেখতে চাই আমার টাকা ছাড়া তোমায় এত বুলি আসে কি করে। তুমি যা, তা শুধু আমার দয়ার জন্য। গেট লস্ট।

মাপ করবেন সার। চৌধুরী আর মিসেস বোস। ও ইয়েস, সিট ডাউন, সোমপ্রকাশ অন্যমনস্ক ভাবে বলে উঠেন। মিসেস বোস আর চৌধুরী দৃষ্টি বিনিময় করে। চৌধুরী, পাতলা হয়ে আসা চুলে আঙুল সঞ্চালন করতে করতে সোমপ্রকাশ বলেন, তুমি একটু তেজরিওয়ালের কাছে গিয়ে অর্ডারটা ফাইনালাইজ করে এস। ন্যাকের কাছে আঙুলটা ফিরে আসতে ইয়ার্ডলি ক্রীমের সুগন্ধ ভেসে আসল। গত কুড়ি বছর এই হেয়ারক্রীম তিনি ব্যবহার করছেন, তবু গন্ধটা তো আগে এত মিষ্টি লাগেনি।

মিসেস বোসকে চিঠি ডিক্টেট করতে করতে ক্রীমটার কথা ভাবছিলেন সোমপ্রকাশ। ওই দেশ থেকেই তো আসছে সূর্য। সূর্যপ্রকাশ দত্ত, তাঁর একমাত্র ছেলে। —দশটা চল্লিশে দাঁড়িয়ে ঘড়িটা হাসছে।

সোমপ্রকাশ নিজেই ভাবতে পারেননি সূর্য কথাটার এত গুরুত্ব দেবে। কোনো কর্মচারীকে ধমকে দেবার পর যেমন নিশ্চিন্ত থাকেন তেমনই ছিলেন। তবু সূর্য ওর মার বারণ, বোনের অনুরোধ কিছুই শোনেনি। ওই ওল্ড ম্যানটাকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই মা, আমার ক্ষমতা। উঃ, সুযোগ না পেলে, আগে থেকে স্কলারশিপটা না যোগাড় করা থাললে কি এতটা সাহস দেখাতে পারতো ?

আজ 'তাঁর' স্ত্রী, 'তাঁর' মেয়ের বড় পরিচয় তারা সূর্যপ্রকাশের মা, বোন। সকাল থেকেই কি আনন্দ বাড়িতে, কি উচ্ছ্বাস, যেন কারুর জন্মদিন। তিনিও বিচলিত হয়েছিলেন, তবু তা প্রকাশ করেননি। নিজেকে তৈরী করছিলেন তিনি। টেলিগ্রামের চড়টা তাঁরই গালে পড়েছিল। কারণ তাঁর উদ্দেশ্যেই করা ওটা। তবু এক ঝলক রক্ত হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা মেরেছিল একবার —ঘড়িটায় দশের শূন্যটা মুছে গেল, একটা এক দেখা দিল।

তিনি কোনোও ক্ষোভ মনে জমা রাখবেন না। তাহলেই তো হার স্বীকার করা। সূর্য ফিরে আসছে, বুঝতে পেরেছে বলেই। তাই কি ? তাহলে ওই টেলিগ্রাম ? স্ত্রী বললেন, দেখেছ এখনো সূর্য ডার্লিং কি দুষ্টু আছে'। এটাকে ওরা দুষ্টুমি বলে।

রিভলভিং চেয়ারটা পেছনে ঘোরালেন সোমপ্রকাশ। না, পেছনে জানলা নেই। কাঠের প্যানেলিং করা দেওয়ালে একটা ফটোগ্রাফ, সোমপ্রকাশ আর তাঁর স্ত্রীর। ইংলণ্ডে নটিংহামশা'রে তোলা। সূর্য যখন ওর মার গর্ভে সেই তখনকার ছবি। শক্ত করে চেয়ারের হাতলটা ধরলেন।—এগারোটা বারো। দপ, দপ·····।

ঘরের দরজা খোলার শব্দ তিনি পাননি। একটা দমকা বাতাস যেন দরজাটা হঠাৎ খুলে দিল, তিনি আগল দেবার আগেই। হ্যালোও বাপি! বহুদূরের ওপার হতে কণ্ঠস্বরটা যেন ভেসে এল। শুনে তিনি চমকে উঠলেন না। ধীরগতিতে চেয়ারটাকে ঘোরালেন। চশমাটা ঝুলে পড়েছিল, নীচু হয়েই ঠিক করলেন সেটা। মুখ তুললেন, সামনে দাঁড়িয়ে চকচকে সূর্যপ্রকাশ, পেছনে স্ত্রী, মেয়ে। ওদের ঘিরে কত হাসি। ঠোঁটে হাসি আনতে বাধ্য হলেন সোমপ্রকাশ দত্ত। বললেন—কেমন আছ সূর্য ?

কোথায় যেন খচ্ করে কে একটা কাঁটা বিঁধিয়ে দিল। তিনি বুঝলেন তার সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু বদলে গেছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ অটোনমির পুরোনো প্রসঙ্গ হালে আর একবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা হলেই ভাল হত। উপস্থিত স্থানাভাবহেতু মাত্র দু'জন ছাত্রের বক্তব্য প্রকাশ করা গেল—একজন অটোনমির পক্ষে, অন্যজন বিপক্ষে। অটোনমি বিষয়ে এ'দের মতামত বড় জোর প্রতিনিধিস্থানীয়, তার বেশী কিছু নয়। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তাভাবনা হোক এটাই কাম্য—আমরাই ঠিক করি কি আমাদের প্রয়োজন, কোনটারই বা গুরুত্ব বেশী।
সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখাটি প্রস্তুত করেছেন সুব্রত সেন।

প্রসঙ্গ ঃ কলেজ অটোনমি

একটি বিতর্ক

শিবব্রত রায়

অটোনমি, বা বলা ভালো অটোনমিকে যে চেহারায় আমাদের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে, আমি অবশ্যই তার বিরোধিতা করি। অটোনমি হলে যে পরিবর্তনটা হবে, সেটা আমার মতে অতি সামান্য—কলেজের অর্থনৈতিক ব্যাপারে কিছুটা উন্নতি এবং শিক্ষার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধে, যেমন সিলেবাস ঠিক করা, পরীক্ষা নেওয়া—এই সব জিনিসগুলো সরাসরি আমাদের অধ্যাপকদের হাতে আসবে। এর থেকে বেশি কিছু পরিবর্তন অটোনমি দিতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।

প্রথম কথাটা ধরা যাক। সেটা কলেজের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা। কলেজের অর্থনৈতিক উন্নতি অবশ্যই আমার কাম্য, কিন্তু আমি যখন এ বিষয়ে কথা বলছি, তখন কেবলমাত্র এই কলেজটাকে আমার view তে রাখছি না। এই প্রসঙ্গে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি কলেজকে আমি আমার ধারণার মধ্যে আনছি। শুধু মাত্র বিশেষ কয়েকটি কলেজের অর্থনৈতিক উন্নতি আমার কাম্য নয়। আমি মনে করি, গোটা ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। তা নইলে, শিক্ষাটা যদি অধিকার না হয়ে কেবল মাত্র সুযোগ হয়ে থাকে, তাহলে সেটা ভারতবর্ষের মত দেশে শাসকশ্রেণী দ্বারা ব্যবহৃত হবার সুযোগ থেকে যায়।

দ্বিতীয় কথা, অটোনমি হলে, সিলেবাস ঠিক করা, পরীক্ষা নেওয়া ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলো সরাসরি আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে। কিন্তু সিলেবাস ঠিক করা, বা পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতিতে পরিবর্তন; এগুলোকে আমি আদপেই কোন মৌলিক পরিবর্তন বলে মনে করি না। বরঞ্চ, অটোনমি বা স্বাধীনতা বলতে আমি যা চাই তা হল চিন্তার স্বাধীনতা।

কিন্তু এখানে অটোনমি বলতে যা বোঝাচ্ছে, তা হলে সবসময়েই U.G.C. অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ থেকে যাচ্ছে। একদম পরিষ্কার এটা। সুতরাং আমি অটোনমির বিরোধিতা করছি। কেন্দ্রীয় সরকার ইদানিং শিক্ষাক্ষেত্রে যে মাত্রাগুলি নিচ্ছেন, তাতে আমি মনে করি না যে তাদের অধিকারের ক্ষেত্র প্রসারিত হলে কোন রকম চিন্তার স্বাধীনতা, বা বক্তব্য রাখার স্বাধীনতা, বা পঠনপাঠনের স্বাধীনতা—এগুলো সম্প্রসারিত হবে। এই স্বাধীনতাগুলোকে বাদ দিয়ে, শুধুমাত্র সিলেবাস ঠিক করার স্বাধীনতা বা পরীক্ষার স্বাধীনতা—এই জিনিসগুলো অর্থহীন।

আমরা বাস করি একটা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে। এই ধরণের সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থা কখনো শ্রেণীসম্পর্কগুলোর বাইরে থাকে না। এবং শাসক শ্রেণীর যে Executive body, অর্থাৎ কিনা সরকার, সে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করবেই—সেটা আটকানো সম্ভব

নয়। সত্যি কথা বলতে কি, একটু আগে আমি যে স্বাধীনতাগুলোর কথা বলেছি, অর্থাৎ চিন্তার স্বাধীনতা, বক্তব্য রাখার স্বাধীনতা এবং পঠনপাঠনের স্বাধীনতা, তা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আদপেই সম্ভব নয়। সে জন্য একটা অন্যরকম সমাজব্যবস্থা দরকার। কিন্তু, এর মধ্যেই আমরা যেটুকু পেতে পারি সেটুকুও যে সরকার ধ্বংস করছে, তাকে আমরা কি করে মেনে নিই? বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তা বিলের কথাটাই ধরা যাক। সেটাতে বলা হচ্ছে, প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা 'নিরাপত্তা বাহিনী' পোষা হবে, এবং সেই নিরাপত্তা-বাহিনীর যে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ তার ক্ষমতা এক অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের থেকেও বেশি। কখনো কোন প্রশ্নে কোন প্রকার **agitation** দেখা দিলে (এবং হয়তো **agitation** না দেখা দিলেও!) তিনি উপাচার্যের অনুমতি ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে কি আমাদের কলেজ এখন যে অবস্থায় আছে তাতে আমরা খুশী? না, আমরা খুশী নই। নিঃসন্দেহে খুশী নই। কথা হচ্ছে একটা অবস্থায় আমরা সন্তুষ্ট নই, কিন্তু **alternative** তো অনেক আছে। তার ভেতর থেকে অটোনমিটাই যে কেন বিশেষভাবে বাছব, সেটা তো খুব পরিষ্কার নয়।

তাহলে অটোনমির বদলে আমি কি বাছব? অটোনমির বদলে আমি যেটা বাছব, সেটা হচ্ছে সাধারণ ভাবে শিক্ষার উন্নতি। এবং সার্বিক ভাবে। শুধু প্রেসি-ডেন্সি কলেজেরই উন্নতি, এমন নয়। আমি যা চাই তা হল, শিক্ষাটা গোটা ভারতবর্ষে সুযোগের বদলে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক। এখনো ভারতবর্ষের মোটে তিরিশ শতাংশ লোক সাক্ষর। এবং সে সাক্ষরতার অর্থ কেবল মাত্র নাম সই করতে পারা। এখনও ভারত-বর্ষের সমস্ত মানুষকে ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষাটুকু দেবার মত আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায় না, এবং কেন্দ্রীয় সরকার (তাঁর হাতেই ভারতের তাবৎ অর্থের পুঁজি, সুতরাং আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কথা উল্লেখ করছি) যেখানে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করেন কুড়ি শতাংশ, সেখানে শিক্ষা খাতে এক শতাংশের সামান্য কম বেশি তার ব্যয়। শিক্ষার গুরুত্বটা যে এই দেশে কত কম, তা এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়।

এখন এই ব্যবস্থাটা হোক। অর্থাৎ কিনা, শিক্ষা-ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে গুরুত্বটা বেশি পড়ুক। এটাই আমি চাই। গোটা সমাজটাকে বাদ দিয়ে, কেবল মাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষার উন্নতি কোনমতেই আমার কাম্য নয়।

ভানুসিংহ ঘোষ

অটোনমির যারা বিরোধিতা করছে তাদের যুক্তিটা আমার মাথায় ঢুকছে না। তারা বলছে কলেজে অটোনমিটাই বড় কথা নয়—সার্বিকভাবে শিক্ষার উন্নতি, পঠনপাঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা করার স্বাধীনতাটাই বড় কথা। ঠিক কথা। এই জন্যেই তো আমি অটোনমি চাইছি। ঠিক যে যুক্তিতে ইদানীং কয়েকটি রাজ্য বলে 'রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দাও' সেই যুক্তিই আমাকে বলাচ্ছে 'প্রেসিডেন্সি কলেজকে অটোনমি দাও।' মানে, সোজা কথা, কলেজের হাতে আরো বেশি ক্ষমতা দাও। যাতে কলেজের পক্ষে যা ভালো হবে, যা মন্দ হবে সেটা ঠিক করার দায়িত্ব কলেজের লোকজনের ওপরই বর্তায়। একটা নিয়ম বেঁধে সবাইকে একইরকমভাবে সেই নিয়মে fit করা, সেটা তো সম্ভব নয়। এটা যে কেউই মানবে। Equality কখনোই সম্ভব নয়—কেননা genetics জিনিসটাকেই তো তাহলে অস্বীকার করতে হয়। অথচ আমাদের কলেজকে অন্যান্য কলেজের সঙ্গে একই জায়গায় fit করাবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

অটোনমির সঙ্গে জড়িয়ে আর একটি অভিযোগ আসছে, এলিটিস্‌ম্‌ সংক্রান্ত। সেটা হচ্ছে বুদ্ধিমানসে জনসাধারণের থেকে আলাদা একটা গোষ্ঠী তৈরী হয়ে যাওয়ার আশংকা। এই ব্যাপারটাই বেশ বোকা বোকা। আমার মনে হয় এলিটিস্‌ম্‌ কথাটার আজকাল একটা কদর্থ করা হয়। এটা খুব স্বাভাবিক যে একটা মানুষের যদি বেশি বুদ্ধি থাকে, তাহলে সমান সুযোগ পেলেও সে ওপরে যাবে। তাহলে এলিটিস্‌ম্‌ এর অভিযোগটা আসছে কেন? তাহলে তো লম্বা লোককে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে এক মাপে আনতে গেলে তার মুণ্ডুটাই কেটে বাদ দিয়ে দিতে হয়। সেটা নিশ্চয় কাম্য নয়।

সেটা কথা নয়। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা একটা ভীষণ গোলমেলে জাঁতাকলে পড়ে গেছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে কি বস্তু, সেটাও হাড়ে-হাড়ে, মর্মে-মর্মে বুঝতে পারলাম। অথচ আমাদের মধ্যে অনেকেই এসেছিল সত্যিকারের পড়াশুনো করার ইচ্ছে নিয়ে। এখানে নিশ্চয় আমরা ম্যানেজমেণ্ট পরীক্ষা দেবার জন্য আসি নি, বা স্মার্ট একজিকিউটিভ, কি উচ্চপদস্থ সরকারী 'অফ্‌সার' হবার বাসনা নিয়েও আসি নি। আমাদের বেশির ভাগেরই ইচ্ছে ছিল পড়াশুনো করার, কিন্তু যেরকম ভাবে পড়ানো হয় সেটা আমাদের ভালো লাগেনা, অতএব পড়াশোনাটা একটা বোঝার মত হয়েদাঁড়িয়েছে। এই জিনিসটা আমার হয়েছে, বেশির ভাগেরই হয়েছে —অথচ এমনটা হবে এই ভেবে নিশ্চয় আমরা এই কলেজে পড়তে আসি নি।

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে আমরা অটোনমি চাইব না কেন? কেউ কেউ হয়তো বলবেন, এই অবস্থা তো সব কলেজেই, তাহলে একই যুক্তিতে ভারতবর্ষের তামাম কলেজকে অটোনমি দেওয়া হোক। খুব ঠিক কথা! আমি একবারও বলছি না শুধু আমাদের কলেজকে অটোনমি দাও, অন্যদের দিও না। আমি শুধু বলছি যে প্রেসিডেন্সি কলেজকে এখনই অটোনমি দাও। তার কারণ এই কলেজের এই মুহূর্তে অটোনমি গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে। প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকরা রয়েছেন, রিসার্চ করবার সুযোগগুলো রয়েছে—অটোনমি পেলে বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মর্যাদা পেলে, শিক্ষার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হবে বলে আমার ধারণা। অন্যান্য বেশির ভাগ কলেজে এই সুযোগগুলো নেই, তাই তাদের এই মুহূর্তে অটোনমি দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এখন প্রেসিডেন্সি কলেজ অটোনমি নেবার জন্য পুরোপুরি matured, এটা ঠিক কি না তা কে বিচার করবে? এখানে আমার মনে হয় সব থেকে গ্রহণযোগ্য মতামত U. G. C.-র পক্ষেই রাখা সম্ভব। আপনি আমি কি বললাম না বললাম, তার থেকেও U G.C.-র মতামতটাই দামী বেশি। পশ্চিমবঙ্গের অনেক ছাত্র-সংগঠন অবিশ্যি মনে করেন যে U G. C মোটেই ছাত্রদের কথা ভাবেন না। এই দাবীটা কদ্দুর সত্যি, সেটা বোঝা মুশকিল, কারণ পশ্চিমবঙ্গে ঠিক সেই অর্থে কোন ছাত্র সংগঠন আছে বলেই তো মনে হয় না। সে সংগঠনগুলো আছে তারা ছাত্রদের পার্টি ফোরামে represent করার বদলে, পার্টিকে ছাত্রদের মধ্যে represent করে। সুতরাং এই ছাত্র সংগঠনগুলো সব সময়েই পার্টির দাদাদের কথা বলে। এটা খুব দুঃখজনক। কারণ, একদম সরাসরি বলতে গেলে এর দ্বারা ছাত্রদের শুধুমাত্র 'টুপি' পরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সুতরাং এই সব ছাত্র সংগঠনগুলোর পার্টির মুখচাওয়া কথাবার্তা আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

আসলে আমি ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমাকে যদি আমার মত পড়বার সুযোগ না দিয়ে অন্য কারো মত পড়তে বলা হয় সেটা নিঃসন্দেহে খুব খারাপ ব্যাপার হবে। এখনকার এই কলেজের কাঠামোতে নিজের মত পড়তে পাওয়াটা কোনও ভাবে সম্ভব নয়, অটোনমিটা তাই এত গুরুত্বপূর্ণ। অটোনমি এলে তবেই প্রতিটা ব্যক্তির নিজস্ব বিকাশের সুবিধে হবে। এই কাঠামোতে সেটা সম্ভব নয়। আমরা সবে পার্ট ওয়ান দিয়েছি, কিন্তু কিরকম ভাবে দিয়েছি? কিছু কিছু সাজেশন পেয়েছিলাম, সেগুলো ঝেড়ে মুখস্থ করেছি, তারপর পরীক্ষার খাতায় বমি করার মত করে লিখে দিয়েছি। কিছু মনে নেই এখন আর। এরকম আরো অনেকেই করেছে, যারা ভালো রেজাল্ট করেছে তাদেরও অনেকের এই দশা। অর্থটা কি? এখানে আমার নিজস্বতা ফুটে উঠছে না এর আগে বারো বছর পড়াশুনো করার পরেও। আমার ভোট দেবার অধিকার হল, কিন্তু নিজের মত করে পড়াশুনো করবার অধিকারটা তৈরী হল না, এটা কি উচিত?.....

আসলে আমার ইচ্ছে নয় যে প্রেসিডেন্সি কলেজ তার যুগ যুগান্তের ঐতিহ্য নিয়ে স্মার্ট এক্সিকিউটিভ বা জবরদস্ত সরকারী 'অফ্‌সার' তৈরীর কারখানা হয়ে উঠুক। এরকম কারখানা অনেক আছে, তার একটাতে লকআউট হলে কিছু এসে যায় না। অটোনমি বিরোধীরা কি বলেন?

আরো কিছু কাজের কথা

॥ ১ ॥

পুরনো কলেজ পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি উল্টেপাল্টে দেখলে যেটা সবার আগে চোখে পড়বে তা হল নিবন্ধগুলির সুরের বৈচিত্র্য। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট, যখন ছাত্র-সংসদে যে ধরণের গোষ্ঠী ক্ষমতা অধিকার করেছে, সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা হয়েছে তাদের মূল সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে।

গত বারের কলেজ পত্রিকার দিকে তাকানো যাক। সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা হয়েছে 'অরাজনীতিক'দের বিদ্রূপ করে, লেখার ধার এমন উন্নত শ্রেণীর যে কায়দা করে অরাজনীতিকদের হেয় করবার একটা প্রচেষ্টা অত্যন্ত স্পষ্ট। খুবই দুর্ভাগ্যজনক এটা, কারণ সে বছর ছাত্র সংসদে কোন রাজনৈতিক প্রভাব ছিল, ওবং সেই গোষ্ঠীর অরাজনীতি বিরোধী সোচ্চার মন্তব্য সম্পাদকের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। শুধু গত বারের কলেজ পত্রিকাই নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্পাদকীয়র দিকে চোখ ফেললেই এই ঘটনা চোখে পড়বে। ছাত্র-সংসদের নির্বাচিত গোষ্ঠী যখন যে রাজনৈতিক মতের ধামা ধরেছেন, তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে কলেজ পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলো।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা, ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বলা চলে, রাজনৈতিক ভাবে অত্যন্ত সচেতন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা এই কলেজে না হলেও এই কলেজ তাতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। সেই আন্দোলনের উষাকাল থেকে নকশাল আন্দোলনের সায়াহ্ন পর্যন্ত যে সমস্ত আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রসমাজ নিজেকে জড়িয়েছে, তার কোনটার সঙ্গেই প্রেসিডেন্সি কলেজের যোগাযোগ ছিন্ন হয় নি। এই ইতিহাস প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের রাজনৈতিক সচেতনতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

অথচ গত দু বছরের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিকে তাকালে এটা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে ইদানীং কালের ছাত্ররা অরাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। খুব আলগাভাবে দেখতে গেলে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই কলেজের ছাত্ররা রাজনৈতিক সচেতনতা হারাচ্ছেন। অথবা আমাদের দেশ এখন এমন রাজনৈতিক স্থিতাবস্থায় পৌঁছে গ্যাছে যে এই কলেজের ছাত্ররা রাজনীতি নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাইছেন না। কিন্তু এই দুটোর কোনটাই এই প্রতিবেদকের মতে গ্রহণযোগ্য নয়। এবং অরাজনীতির অনুপ্রবেশের এই ঘটনাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা সম্ভব।

যে কোন সুস্থ, সাধারণ নাগরিকই বোধ হয় একথা স্বীকার করবেন যে এই দেশে রাজনীতি তার চারিত্রিক সততা হারাচ্ছে। দেশের কোন রাজনৈতিক দলই সততার মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে নেই, বরং চরম সুবিধাবাদকে নিজস্ব ধর্ম করে নিচ্ছে। সেদিকে থেকে দেখলে এই সময়টা চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ, যার মধ্যে পড়ে সাধারণ মানুষ উত্তরোত্তর তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠছে, এবং ক্রমশ নিস্পৃহ হয়ে যাচ্ছে। সেই নিস্পৃহতার সূত্র ধরে রাজনীতিবিদ্‌দের ধ্বজা সরিয়ে এই কলেজে অরাজনীতি জায়গা করে নিচ্ছে, গত পত্রিকার বিরূপ সম্পাদকীয় সত্ত্বেও এ কথা সত্যি।

মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। তাকে সমাজে বাস করতে গেলে রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়তেই হবে, এ কথা তত্ত্বগত ভাবে অত্যন্ত সত্য। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতি যে পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং ছাত্র রাজনীতি যে ভাবে মানুষের মূল্যবোধকে নষ্ট করছে তাতে যদি সুস্থ ও মূল্যবোধ সম্পন্ন এই কলেজের ছাত্ররা 'অরাজনীতি'কে বেছে নেয়, তাহলে তাদের দোষারোপ করার কিছু নেই। রাজনীতি থাক বা না থাক সুস্থ মূল্যবোধের জয়ে আমরা খুশি।

॥ ২ ॥

এই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের তুমুল উৎসাহে গত বছর ভালোয় মন্দে কেটেছে। রবীন্দ্র পরিষদ্ কর্তৃক আয়োজিত কবিসম্মেলন কিংবা বিতর্ক সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত জ্ঞান মঞ্চে আমন্ত্রণমূলক বিতর্ক, কোন জায়গাতেই উৎসাহের অভাব হয় নি।

এ বছর কলেজের ঘেরা মাঠে পুরোদস্তুর খেলাধূলো হয়েছে। ফুটবল টুর্ণামেণ্টে ফাইনালে রসায়নকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে অঙ্ক-রাশিবিজ্ঞান দল। টেবিলটেনিস, দাবা, ক্যারমও অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর সারা বছর জুড়ে সাদা জামাপ্যাণ্ট আর সাদা টুপি পরে ক্রিকেট খেলেছে কলেজের তরতাজা ক্রিকেট টিম। আর্টস বিল্ডিংয়ে শিবমন্দিরের কাছে যে খণ্ডহর ছিল সে জায়গাটা মেরামতি হয়েছে এবং কোর্ট কেটে ব্যাডমিণ্টন আর ভলিবল চলছে পুরোদমে।

প্রমোদের ক্যাণ্টিন বিপজ্জনক জায়গা থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে নিরাপদ ছাতের তলায়। ছাত্ররা কলেজে গাছ পুঁতে কলেজের সবুজ রং বাড়াবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গাছ বাঁচে নি।

॥ ৩ ॥

এই পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হবার ফলে কলেজ পত্রিকা প্রসঙ্গে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। বেশির ভাগ কথাই অত্যন্ত বৈষয়িক, টাকাকড়ি সংক্রান্ত। কলেজ পত্রিকার জন্য ছাত্র সংসদের হাতে যা টাকা আসে তাতে কলেজ পত্রিকা প্রকাশ করা দিন দিন দুরূহ হয়ে উঠছে। প্রতি বছর পত্রিকা বের করা অসম্ভব, দু বছরে একবার পত্রিকা প্রকাশও আর বেশিদিন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং কলেজ পত্রিকার ব্যাপারে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করা প্রয়োজন।

অন্য কোন রকম ভাবে টাকার সংস্থান বাড়ানো না গেলে, কলেজ পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন নেওয়ার ব্যাপারটাও ভাবতে হবে। কলেজ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন নেওয়া যাবে না এ রকম কোন নিয়ম নেই। তবু যে বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না তার কারণ হল অতীতে কখনো এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন সংযোজিত হয় নি। বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে আপত্তির এটা কোন যুক্তিই নয়। যেখানে বাংলা ভাষায় সব পত্রিকা বেঁচে আছে বিজ্ঞাপনে ভর দিয়ে, সেখানে শুধুমাত্র ঐতিহ্যের খাতিরে বিজ্ঞাপন না নিয়ে কলেজ পত্রিকার ক্ষয় দেখা কোন কাজের কথা নয়। ভবিষ্যতে কলেজ পত্রিকা যদি তার ঐতিহ্য নিয়ে প্রকাশিত হতে চায়, তাহলে তার খরচের ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে এখনই খতিয়ে দেখতে হবে।

কলেজ পত্রিকার নড়বড়ে বাজেটের মধ্যে আমাদের অবস্থা হয়েছে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় গোছের। ফলে কলেজ পত্রিকার পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমেছে, কাগজের মান নেবেছে, অঙ্গসজ্জা বাহুল্যবর্জিত। এর মধ্যেও আমরা ভালো লেখা বেছে নিয়েছি, যাতে করে অঙ্গসজ্জা প্রভৃতি বাহ্য ব্যাপার সবার কাছে গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কলেজ-পত্রিকা উৎসাহী পাঠককে তৃপ্ত করলে আমরা খুশি।

॥ ৪ ॥

এই লেখার প্রথমেই ধন্যবাদ জানানোর একটা ব্যাপার থাকা উচিত ছিল। এই কলেজ পত্রিকার ব্যাপারে অনেকেই বিভিন্ন মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন, যদিও সক্রিয় সাহায্য ছাত্রদের কাছ থেকে খুব বেশি পাই নি।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীসুকান্ত চৌধুরী যে উৎসাহ আর উদ্যমের সঙ্গে কলেজ পত্রিকার প্রতিটি পদক্ষেপে সাহায্য করেছেন তা না করলে কলেজ পত্রিকা বের হত কিনা সন্দেহ। লেখা বাছাই থেকে শুরু করে পত্রিকা পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রত্যেকটি পদক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে তিনি সাহায্য করেছেন।

এ ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদার্হ হলেন অরিজিৎ সেন, সোমক রায়চৌধুরী, ভাস্কর সরকার, প্রদীপ গুপ্ত আর এ পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় সুদীপ্ত সেনগুপ্ত আর বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোষ, যাঁরা বিভিন্ন ভাবে এ পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে আন্তরিক সাহায্য করেছেস।

এই পত্রিকায় যে দোষত্রুটি রয়ে গেল, তার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে আমি দায়ী থাকলাম। অলমিতি।

ফেব্রুআরী ১৯৮৪

সুব্রত সেন

Philip Larkin : A Preface

Nirmalya Ghoshal

I listen to money singing. It's like looking down
From long french windows at a provincial town
The slums, the canal, the churches ornate and
mad
In the evening sun. It is intensely sad.
('Money' ; *High Windows*)

Perhaps the note of sadness is unavoidable when one writes poetry in this world of instability and crisis. Philip Larkin, provides no exception. The economic hiatus between different classes of people gets widened everyday, and a working middle-class man generally becomes an aged, stooping person in no time, resembling what Yeats called long ago 'a paltry thing'.

A tattered coat upon a stick.

To Larkin this image is a bit different but essentially the same. He feels that

I can
Never in seventy years be more a man
Than now—a sack of meal upon two sticks
(The North Ship).

As in Yeats's 'Sailing to Byzantium', which provides Larkin's poem with its property-basket of metaphors, the central idea is that a poet makes up for the disappointments of his life through his art.

To Larkin, life is
.....first boredom, then fear,
Whether or not we use it, it goes,
And leaves what something hidden from
us chose,
and age, and then the only end of age.
('Dockery and Son' : *The Whitsun Weddings*)

This negative attitude to life often prompts him to write satiric pieces. In 'Annus Mirabilis' he speaks of the growing sexual permissiveness in society like a man who himself has just missed the bus :

...life was never better than
In nineteen sixty-three
(Though just too late for me)—
Between the end of the Chatterley ban
And the Beatles' first LP.
(High Windows)

and in the piece called 'This Be the Verse' Larkin passes his sentence on mankind :

Man hands on misery to man.
It deepens like a coastal shelf
Get out as early as you can,
And don't have any kids yourself.
(High Windows)

Though different in tone, the opening of another poem again reveals Larkin's pessimistic stance :

Always too eager for the future, we
Pick up bad habits of expectancy.
('Next Please' : *The Less Deceived*)

These lines seem to support Colin Falck, who said in a review of Larkin's poem that Larkin misrepresents life, in the sense that he implies that life is pointless. 'Futile though life may be for the majority of people in our present society', Falck says, 'it is not futile in principle in the way that Larkin makes it seem'. It is often alleged that Larkin's views are negative. Ian Hamilton, who in other respects admires Larkin (as Colin Falck does), suggested that the great drawback of Larkin's work is its 'rather narrow range of negative attitudes'.

While conceding that Larkin's poems often express ideas predominantly negative, we must also grant that Larkin is a poet who is sensitive enough to write poetry not from a preconceived set of principles but as a direct and personal response to particular experiences. If these experiences provide him little cause for hope, then his poetry is bound to be devoid of it.

Though hailed as the best poet England now has, Larkin is often called 'minor' as a poet. The only reason behind this label must be the small bulk of his work. Larkin's poetic reputation rests on less than one hundred poems. Until 1974 he had published only five volumes of poetry, *High Windows* being the latest. (The others are : *The North Ship* (1945) *XX Poems* (1951), *The Less Deceived* (1955) and *The Whitsun Weddings* (1964).) The high reputation which Larkin has achieved has, in fact, been won almost in spite of the poet himself. That he writes so little—about four poems a year, as he suggests—is part of a general tendency to keep himself away from public notice, and to eschew the popular image of the poet. Yet Larkin's verse is appreciated by a very wide range of readers. This is not to say that Larkin's poems are slight or simple : they are often complex, but never unnecessarily obscure. In fact Larkin has often expressed his disapproval of the obscurity of Eliot's poetry and of much so-called 'modern' verse.

Larkin has been considered by many to be the best of the Movement poets. A. Alvarez has said that Larkin embodies 'everything that was best in the Movement and at the same time shows what was finally lacking'. One cannot agree with Alvarez, partly because one thinks that Larkin does not share the faults of the Movement, and partly because Larkin's poetry does not seem to be so typical of that produced by the Movement that it may be picked out as the epitome of its virtues. None the less, Larkin is so often considered in the context of the Movement that a knowledge of what it is and its chief characteristics is important for understanding Larkin's poetry.

At about the time Dylan Thomas died (in 1953) there was a reaction against the kind of uninhibitedly romantic and emotionally direct poetry which Thomas wrote and against romanticism in general. The call was for a formally strict poetry that would be rationally and morally coherent, and that would offer poised, intelligent comments on life rather than uncover the depths of the unconscious. For a few years young poets wrote cool, adroit verse according to these prescriptions, although it was noticeable that if the emotive obscurity associated with Dylan Thomas disappeared it was often replaced by the riddling, intellectual obscurity exemplified in the poetry of William Empson, which had a brief but intense vogue in the early fifties. This new kind of poetry became known as the 'Movement', and in 1956 a representative anthology of Movement poetry appeared under the title of *New Lines* which provided a deliberate echo of *New Country*, an anthology of 1933 which first introduced the work of the Auden group to a wide audience.

These writers tried to return to a diction which was recognisably that in which they spoke, a diction that eschewed the high-flown in favour of the colloquial. They took an ironical view of experience, although this sometimes grew into a cynicism that smacked of self-pity. Larkin has a few 'Lines on a Young Lady's Photograph Album' which should be interesting in this context. According to Larkin, photography is an art which

overwhelmingly persuades
That this is a real girl in a real place,
In every sense empirically true !
(*The Less Deceived*)

And talking about self-pity, we find Larkin telling his beloved :

Love, we must part now : do not let it be
Calamitous and bitter. In the past
There has been too much moonlight
and self-pity.
(Poem XXIV : *The North Ship*)

In the present, too, we might add.

A contemporary of the Movement poets and later associated with the group itself, Kingsley Amis sums up the shortcoming of these writers when he says : 'Their great deficiency is meagreness and triviality of subject-matter : nobody wants any more poems on the grander themes for a few years, but at the same time nobody wants more poems about philosophers or paintings or novelists or art galleries or mythology or foreign cities or other poems'. Larkin, however, has never eschewed the great theme on principle, nor the heightened diction that is often necessary for its statement. Until recently, he had not written on public events in his poetry, but written insistently on those themes which are of perennial importance : the conflict between what we are and what we imagine ourselves to be, the destructive effects of time and suffering as they hurt and mature us :

It grief could burn out
Like a sunken coal,
The heart would rest quiet,
The unrent soul
Be still as a veil ;
(Poem *XVIII* : *The North Ship*)

The endlessly complex relationships between people :

My wife and I have asked a crowd of craps
To come and waste their time and
ours perhaps
You'd care to join us ?
... ...
Funny how hard it is to be alone.
... ...
Just think of all the spare time that
has flown
Straight into nothingness by being filled
With forks and faces,
(Vers de Societe : *High Windows*)

and the urge to slough off what Yeats called 'all this complexity of mire and blood', for Larkin thinks :

Perhaps being old is like having lighted rooms
Inside your head, and people in them, acting.
People you know, yet can't quite name.....
(The old fools' : *High W.*)

and feels that

At death you break up ; the bits
that were you
Start speeding away from each other for ever
With no one to see.
('The old fools' : *High W.*)

Technically, Larkin's language is never flat, unless he intends it to be so far a particular reason, and his diction is never stereotyped. Poetry is his medium, not his subject. Larkin farther brings a novelist's eye to his precise reflections of and on contemporary English life ; he is a poet of provincial landscape and domestic interiors and small human defeats and triumphs. It is not surprising that Hardy is the poet whom Larkin admires above all others and who has greatly influenced him. It Larkin's poetry lacks large romantic gestures or defiant modernist assertions, his best poems have a marked aesthetic intensity below the deceptively realistic appearance. It is true that Larkin's dominant mood is of melancholy

and autumnal regret and a sense of time inexorably passing. But whether one likes it or not, this has been a prominent mood in all English poetry since the Romantic movement. In common with Dr. Johnson, Larkin sees in life 'much.....to be, endured and little to be enjoyed'; and like the blues singer's art, Larkin's poetry mediates between this experience and his audience. His forms are 'traditional' rather than 'modern', but they are various, and unmistakably constitute a full response to contemporary life.

To round up our discussion, then, we can again go back to Falck who considers Larkin to be making life seem futile, presumably by the expression of those 'negative attitudes' to which Hamilton refers. There is certainly an element in his work that suggests that he would like to be out of life altogether. Perhaps it reaches its most explicit statement in the title-poem of *High Windows*. It is a poem about the way successive generations dispense with the taboos of their predecessors. But Larkin implies that real freedom has nothing to do with the lifting of social restraints :

> Rather than words comes the thought of high windows :
> The sun-comprehending glass,
> And beyond it, the deep blue air, that shows
> Nothing, and is nowhere, and is endless.

Such yearning is a yearning for freedom, however, not necessarily a wish to be outside life because living is unbearable. Though Larkin is exhilarated by the idea, his attitude is not negative in the sense that he sees such a state of 'unfenced existence' as a sort of ideal condition, against which life may be matched and found wanting.

A Critique of Physics

Ambar Niel Sen Gupta

The twentieth century has seen mankind take a giant intellectual leap in the understanding of nature. We entered this century doubting Newtonian physics ; within a few decades we were able to construct radically new physical theories that gave us a deeper understanding of nature, and at the same time showed us that nature is far more subtle, far more mysterious than what our forefathers in physics had believed it to be. On a more visible plane, scientific advance in this century is symbolized by man's leap into space and the invention and widespread use of the electronic computer. All these achievements have made almost total faith in what is known as the 'scientific method'. Let us pause here to take a closer look at this method.

Is Science a religion ?

To answer such a question one needs a definition of 'religion'. Most classical religions have at their core a collection of statements about reality or consciousness which are to be believed in. The important thing is that some of these statements may contradict each other, and logical conclusions drawn from the statements need not necessarily be believed in. Deductions are made by a mixture of logic, intuition and faith. Thus classical religions do not, in general, use any standard logic.

Science is also basically a collection of statements that are to be believed in. The distinguishing feature of Science is that this collection is logically consistent ; that is, if we believe in a statement we cannot at the same time believe in its negation, but we believe in any logical conclusion drawn from the statement. Keeping in mind that it is possible mathematically to consider many types of logic, and that Science uses only a particular fixed logic, it appears that a priori Science does not have any 'superiority' over any religion. Of course, from a utilitarian viewpoint Science is 'superior' to any religion. But what we wish to stress here is that Science too is ultimately a set of beliefs.

How precise is physics ?

Faith in physics rests partly on the popular idea that physics deals with precisely defined terms which are used in a clear logical fashion. The fact is, however, that there is actually a great lack of precision in our understanding of the most fundamental terms of physics. A critical reading of even the most elementary physics texts raises questions of fundamental importance : 'what is mass ?', 'what is force ?' etc. In attempting to answer such questions we must realize that in any physical theory there will always be some primitive notions which cannot be defined in terms of other notions. People who believe in the operational philosophy will probably give a set of operations and define the 'mass' of a body to be the result of performing those operations (which may include mathematical calculations) on the body. Such definitions invite instant criticism. Firstly, it is a safe bet that nobody can specify a set of operations that can be performed on all bodies in the universe, and so there will be bodies whose mass remains undefined. Simpler still is the following argument. What if we do not carry out the given set of operations on a body ? The mass of the body would then be undefined. We cannot say that 'we do not know the mass of the body then' since such a statement assumes

that 'mass' exists even if we never measure it, and this contradicts the definition under consideration.

In view of all this, one might well wonder what the familiar equation 'F=ma' really means. All the concepts involved in this fundamental formula of classical physics lack clarity of definition. Yet countless predictions made on the basis of this equation have been verified !

Such defficulties exist also for the concept of length, measurement of time intervals and the physical interpretation of probability theory. All these are not abstruse philosophical problems. Obviously they lie at the foundations of physics.

The physicist's mathematics

Another popular belief that contributes to the respect that physics enjoys is that physicists use sophisticated mathematics to deduce physical results in a perfectly locical manner. Unfortunately, this is far from the truth. Most works on physics are filled with a jumble of ill-defined symbols manipulated by a kind of logic that is more suited to obscure religions than to a branch of science, all this being passed off as the 'mathematics' of physics. Some like to attribute this widespread abuse of mathematics to the physicist's impatience to get results. Abuse of mathematics may thus be excused if one is working on the frontiers of physics. But what about the mathematics of well established branches of physics ? Decades have passed since the invention of differential forms, yet even now virtually all thermodynamics texts work with ill defined infinitesimals. Generalized functions have been studied extensively in mathematics, yet most physics texts, even the most famous ones (Jackson's "Classical Electrodynamics", for example), still use something close to Dirac's original 'definition'. Most popular texts on Classical Mechanics do not even present a gentlemanly version of the techniques of the calculus of variations, let alone use the elegant mathematical devices, like symplectic forms, that can be used to give a correct formulation of the whole topic. In statistical mechanics physicists regularly 'differentiate' integer valued functions. This list can of course be continued. In fairness it must be added that many physicists have accepted good mathematics, especially in the theory of relativity and in some areas of particle physics. What is needed, however, is a big cleansing operation for the whole subject.

Concluding Remarks

Some of the difficulties in correctly formulating a physical theory may be removed if one attempts a formal ('axiomatic') approach. Any physical theory may be formulated in roughly the following manner. There is a set P of physical objects that we believe exist. We name each object of P by a word and using these objects as primitive symbols we build a formal language L. Finally to certain words and sentences in L, which may correspond to physical concepts about the objects in P, we assign mathematical objects which may be called the mathematical 'Models' of the original concepts. Thus, for example, the statement 'the electric field is a vector field' really means that we are using the mathematical object 'vector field' to model the physical object or concept of the electric field. Such an approach would be elegant and would provide clarity and precision to physical theories.

Physics has reached great heights. But let us not forget the foundations and building blocks in our haste to climb higher. Logic and clarity cannot be sacrificed by any branch of Science. Nature is mysterious but let our study of it not grow more mysterious still.

Marxism and Literature

Sudeshna Chakravarty

What is Marxist literature? Is such a concept at all tenable? Marx was a voracious reader and had a wide knowledge of classical and modern literature of Western Europe. His works are studded with literary references. However, neither Marx nor Engels dealt extremely or elaborately with literature, as they did in the fields of economics, politics and history. Nor did they produce any theory of literature, as such. The comments of Marx on Balzac, the more detailed analysis of Tolstoy by Lenin, provide valuable literary as well as sociological insight. Later Marxist critics of the first rank, such as Lukacs, Brecht, Sartre, Adorno, Benjamin, Goldman and others did put forward many such theories, with various degrees of completeness and coherence. However, these differ from each other more than they agree.

One cannot then speak of a general Marxist literary theory. However, Marxism claims to understand the basis of literature, or, at least the reasons for the existence of different kinds of literature in different ages. This is related to the more general theory of the connection between the economic structure and social, political and intellectual life. Literature as part of this life is conditioned, in the last analysis, by the society in which it is born. Such beliefs had been expressed even by some pre-Marxist philosophers. Hegel for instance, finds in *Antigone*, a tragedy by Sophocles, the conflict between old clan ties based on kinship and the new city state based on political association.

Yet the process is not a mechanical one. The interaction between the basis of society and the forces generated by this base works both ways. Indeed if it had not been so, any hope of changing society would have been non-existent. As Engels put it, "The economic situation is the basis, but the various elements of the superstructure—political forms...political, legal and philosophical theories, religious ideas and their further development into systems of dogma—also exercise their influence upon the course of the historical struggles and in many cases preponderate in determining their form".

How far literature enjoys an even greater autonomy has been a matter of debate. Here, obviously, the interaction is still more complex and the scope for individual differences much greater. Literature cannot escape the influence of ideology, insofar as the latter is understood not as a given set of doctrines, but as a whole series of values, ideas and images in which people are enmeshed, not always consciously. Yet the writer and artist unless consciously polemical, cannot and do not reflect this ideology as directly as the jurist, politician, political philosophers, and in many cases, the journalist. Even a consciously polemical work, created by a true artist, often inplies more than it intends. For instance, *1984* by George Orwell, perhaps the most famous anti-communist novel in the world, reaches at least some conclusions not totally comforting to his own side. Balzac, in his novels, portrayed the impossibility of a social order which he wished to restore. Again, all literary forms do not express the prevailing ideology or the author's reaction to it in the some degree, A lyric poem, for instance, may be for more abstract, far less directly related to social reality or ideas, than a novel or a play.

Even within a given field of ideology, a writer may make his choice, take refuge in irony or complexity, or stray into an uncertain path through the vagaries of genius. It was this recognition of this delicate artistic balance which caused Marx to take a somewhat, indulgent view of his volatile friend, Heine, a famous German poet.

While Marxism claims to provide causal insight concerning the social forces that shape a writer or the social ideas that underly his work, it certainly does not reduce the individual to a mechanically determined status. Every act of creation, the genius of every individual talent, retains a certain degree of mystery, which no discipline can fully solve. As Sartre put it, Valerie is a petit bourgeois intellectual, but not every petit bourgeois intellectual is Valerie. Moreover, Marxists do not judge literary worth, or even the validity of a literary picture, exclusively with reference to the political views of the writer. Marx preferred the royalist, Catholic Balzac to the supposedly radical Sue. Lenin was closer to Pushkin than to Mayakovsky. This is not to say that such judgements are necessarily correct, though the one about Balzac was certainly so, but to point out some trends of Marxist criticism.

Apart from the tools of Marxist criticism as applied to general art and literature, there is the specific case of so-called committed literature. Even here, however, there is little unanimity. Some, like Lukaks, prefer the classical realism of the nineteenth century European novel. Others, such a Brecht, choose the path of irony, indirection, parody. The dramatic adoptation of Gorky's *Mother* by Brecht, and the cinematic adaptation of the of the same novel by Pudovkin, shows the very different styles of the three great radical artists. Still others, like some leftist practitioners of the French "new novel", prefer to keep their political convictions apart from their creative work.

Enough has been said of a vast and complex subject to show that Marxism, as applied to literature, is, or should be, a rich field of analysis and experiment, rather than a strait-jacket or rigid guideline.

The Master Form

Arusharka Sen

My brother once had his bicycle stolen. It had been firmly chained to a post, and so my brother was at a loss : how could the thief get away with it ? A master key did the job, he was told. A master key fits into any lock. To me the idea was a novel one.

At the turn of the century, an equally novel idea was simmering inside the world of artistic thought, albeit unconsciously. Art was facing a new kind of invasion. It was around that time that someone, at the back of his mind, perceived the evolution of a new art form. But this one was in no way just another form. Indeed, as cinema grew up, one fact was becoming more and more evident : that it has come to reign supreme by far over all other art forms existent and exhausted. It marked the end of a long wait and the beginning of a new experience.

Right from the time when man got going in search of art, he had been haunted by a myth. It is the myth that brought out the poet in him, the painter in him, the writer, the sculptor, the passionate and vivacious singer in him. The myth survived in the artist's irrepressible desire to confront reality and to delve into it. To feel and to make felt, to see and to show, to perceive and to communicate, to smash, to defy these are the passions which give birth to art. Our 'myth' is the squadron-leader of these passions, the dictator that compells the artist to innovate through medium after medium, forms and counter-forms. With each new medium came its limitations. The artist was no less pained than elated. But he went on striking.

Then at long last it happened. The anvil came to realize what the hammer had to say. The message spread. Had he appreciated its significance, a newspaper editor would have printed : "Reality surrenders ; the myth brought to life." What reality surrendered to was an art form inherent in it, moulded by it ; an art form that is the blood brother of reality. Here was the master form in which centuries of tireless striving of other art forms sought perfection - and found it.

And all this thanks to the myth. "The guiding myth", said Andre Bazin, "dominated in a more or less vague fashion all the techniques of mechanical reproduction of reality, from photography to phonograph". The goal was "an integral realism, a re-creation of the world in its own image". It is only unfortunate that it was as late as the 1950s before Bazin reconized the "myth of total cinema".

Actually with cinema, a realization should have dawned upon the horizon scanners of the world of art. That this was a revolution. A new Gospel. Henceforth almost every art form was to follow a new course. Cinema would teach them to think along the cinema way. What, then, is the cinema way ?

The prime reason why the cinema triumphed in the centuries-old marathon was that it could see (a fact which continues to distinguish cinema from, for example, theatre ; the latter only shows. This is why neither filmed dramas nor theatrical films were ever any great artistic successes.) Only half aware of this fact, people like Thomas Alva Edison suffered quite a shock. Their neat, money-making, audio-

visual barrel-organ shot out of their control and became the symbol of vision. Vision, "the most efficient form of human cognition", gave cinema the most vital support and the strongest bulwark.

Every art wants to make a point about reality. In cinema this is done in a unique fashion. With the help of vision, a film lets reality make a case for itself. A film is a confession of reality. And this confession is put forth bit by bit, the way one proves a theorem. The audience views it, and listens to it, perhaps feels it ; the point is thus made. But the point is not to be enforced upon the viewer. (Utpalendu Chakraborty's "CHOKH" had this problem : the director's anxiety to make a point got the better of what he had to show. The point stuck out like a sore thumb throughout the film).

A master example of how a cinematic process works can be found in Ray's "Aranyer Dinratri". Four young men, a top-level business executive, a middle-class labour officer, a sportsman (jilted by his girl) and a happy-go-lucky gambler, all of them friends, go on a trip to the Palamau forests in Bihar. Then begins the confrontation with reality. The camera presents how these men behave, their unexpected encounter with another family, with women, their tell-tale reactions and finally their departure. Through the finale the director seems to say, "See my point ?" Now all that is not to say that fantasies or animation films cannot be cinema. But all films that are true cinema and sincere works of art may be recognised by one common trait : exploration of the art inherent in reality. Cinema believes that truth is stranger than fiction. This is what was to be learnt from the master form.

Around September 1982, Mr. Satyajit Ray said in the course of a lecture, "...many of our writers seem more inclined to use their minds than their eyes and ears. In other words, there is a marked tendency to avoid concrete observation". This stirred up a hornet's nest. Quite a few writers were indignant at such remarks. Most upset of them was probably Mr. Buddhadev Guha, who vehemently protested : "Writers are neither cameras nor tape-recorders...". Ray's remarks do have one untenable point : using one's mind and using one's eyes and ears are not necessarily two disjointed modes of perception. But by using eyes and ears do writers indeed degenerate into cameras and tape-recorders ? It would be rather naive to think so.

Writers, one believes, were the first ones to realize the vast subtleties to be achieved by using the pen as a camera or tape-recorder. So we find the use of details, flashbacks, montage (various shots assembled to convey a special sense) proliferate in novels and short-stories as well as in films. Sergei M. Eisenstein once quoted a passage from "Oliver Twist". It depicted a morning in the market place of a London suburb. After a brief analysis Eisenstein remarked that with the help of "magnificently typical details" the passage gives "the fullest cinematic sensation of the panorama of a market".

But Dickens was pre-cinema. One can read cinema—in an even more refined from—in the writings of the 20th Century Modernists. The opening lines of Albert Camus' "The Silent Men" shows a middle aged man wearily bicycling on his way to work at a small barrel factory. He is one of the many who are returning after their strike has failed. Camus' pen observes. These reluctant men get back to work silently. They refuse to talk to the boss again. At the end of the day, the mill-owner informs them in a broken voice that his

son has been hospitalized. With a heavy mind the worker slowly pedals his way back home. He sits down with a glass of wine and says to himself : "The boss deserved it". Once again we watch reality manifest itself.

Poetry is a medium that has had occasions to defend itself against questions like "What is poetry ?" Similar questions have been thrown at the cinema. The poet's urge to transcend limits (and limitations), to challenge life, to play with forms are more intense than anyone else's. The poet was stirred up a good deal by our 'myth', and this could be confirmed by the anti-classical tradition that started along with this century. An uncanny darkness was perceived by Jibanananda Das in..."darkness like a camel's protruding neck". The poet was in search off the shortest route to reality. So he wiped his language clean of its habitual logic and built a visual structure with it. "Soon/the dirty water on the unwashed dishes / is going to reflect / another smog-veiled morning" : ...This is how Subhash Mukhopadhyay portrayed daybreak in a working-class life. Critics have praised Mukhopadhyay's remarkable ability to capture life—pulsating and turbulent. And yet this is what the die-hard preachers of pure poetry detest in a poet. "Mukhopadhyay belongs to that class of poets, to whom poetry is less important than people", someone complained. It seems to be bad manners to talk of people. People stink ! Democratia shtunk, said Adenoid Hynkel in "The Great Dictator".

Binodbehari Mukhopadhyay was once working on a mural showing a herd of buffaloes. A few tribals were watching. One of them walked up to him and pointed out that one or two calves should also be present in the herd. Mukhopadhyay later told Satyajit Ray how that addition emboldened the image. Orthodox art-critics however, disfavour such elements of realism in paintings. They go for pure abstraction of form. But they recognize the need for details as a mode of communication between the painter and he viewer. They are also unanimous on another issue-that painters do want to come to reality. In "Art", Mr. Clive Bell wrote about Paul Cezanne's undying endeavours to achieve his goal—the complete expression. Perhaps it was the 'myth' again that drove Cezanne. One knows about Salvador Dali who really took to cinema in order to give vent to his 'sur-realist' ideas. By designing a perfume bottle for a French firm, this painter has recently established a material link between reality and abstraction ! Priced at about £1500 a bottle, this marketable surplus of Dali's sur-realist creative potential is yet to reach the grass-root-level reality !

There have been lengthly discourses on cinema's dependence on other art forms. We have been hearing comments like "Films will realize Bach's dream of finding an optical equivalent of the temporal structure of a musical composition". Cinema has been held as a composite art rather than an art in its own right. The above is only to suggest that sometimes we may think in the reverse direction : from the cinema to other art forms. Only sometimes, not always. Abstruction will be there. But abstraction cannot suppress reality.

Cactus-Flowers

Brinda Bose

Remember
the first night we met
on a pebbled driveway
and you said
you saw cactus flowers in my eyes ?

You took my hand
(later you told me
that you were surprised to find no thorns)
and our love unfolded
in the uncomfortable clutches
of the cactus plants
strewn around.

Remember
our regular college street walkathons
through the rain-drenched afternoons
along battered tram-lines
(was it then that you first felt the pricks
that later made you bleed ?)

We dreamt many dreams,
you and I,
and our vision scanned the far-away
horizons with something like hope.

Remember
the first birthday
we spent together
(was it yours or mine ?
it hardly matters)
we pooled our meagre resources
and bought ourselves
a tiny cactus plant,
rude and angry looking,
and hoped to see it blossom into flowers

(You said
it would be just like me
opening my eyes at dawn)

I sometimes still wonder where exactly
we went wrong.

The sparkle in my eyes
that had held you ("forever" ?) mesmerised
obviously faded away
to reveal a nature far from sunny.....
was it then
that you realized
cacti are better known
for their thorns than for their flowers ?

Whatever it was,
you left,
without so much as a by-your-leave ;
but that was many years ago.

Since then,
many dreams have died, and many others have
taken their place ;
and at last
the flowers have bloomed again in my eyes.

only,
this time
he calls them stars
(the notion of cactus-flowers has not
even occurred, I think)
When we gaze deep into the night together
and hope for the best.

Remember
that summer night
so very long ago
when we did the same ?

By the way, I threw away that cactus plant
this morning.

Interregnum

Malini Guha

I begin to tell you...
after a summer-shower
the streets
re-sound your absence
or
Sundays
are tedious indiscretions
best got over quickly.
But I've told you all this before.
At the end of the road of conversations
words become
the cast-out shells of used-up meanings.
It is time
to write a new peom.
And yet,
too early.
To anticipate nothingness
with expectation
is a feat
I didn't hope to accomplish.
You make everything possible.

a poem

Sudipto Sen

Socrates saw it on a cup
Old Hector in the dust
They all travelled down this way
And I too if I must

Orpheus sang to my stars
But still they wouldn't sleep
Weary of my haunted sky
And a wounded moon that creeps

The moon is older than my day
But the breathless skies will pass
Then I shall lie down on my earth
And breathe my songs to the grass.

Sukumar Ray for Beginners

Sreerup Ray Chaudhury

Wherever Sukumar Ray is read, he is more than appreciated : he is practically an institution, and many of his creations have passed into the common idiom of the Bengali language. But beyond his Bengali readership, he remains inaccessible except for some half-forgotten translations by his eminent son. It was my strong desire that his poems should cross the linguistic barrier ; so it was not long before I undertook to translate a few poems myself.

It was a difficult task. Nonsense verse is never very easy to translate, and Sukumar Ray poses further problems as he loved to burlesque the elements of everyday Bengali life, at once commonplace and untranslatable. Then I remembered Professor P. Lal's dictum, that if poetry cannot be translated, it must be transcreated. And that is just what I have done. I have tried to approximate each outrageous idea in Bengali with a similar concept more familiar to English-speaking readers.

I. The Owl's Love-Song

Said the owl to his spouse, In their sylvan house—
How splendid, my love, is your screech !
All rapt I hear Your notes ring clear.....
Their beauty just robs me of speech.
Such a lilting voice, Of tunes such a choice,
It fills my soul with delight—
Such liquid power Spreads out from your bower
It startles the trees all the night !
Such rhythmic sense Such sweet cadence
Your piercing notes so shrill.....
Their tremulous touch Affects me so much,
My heart is set all-a-thrill !
All fear, all sorrow, All thought for the morrow
All pain, all hate, all trembling,
At the sound of your song Are banished 'ere long—
I dream, O my hook-nosed darling,
Of your face as bright As the moon in the night
And the melody you thus fashion—
To your sweet strains slow My tears overflow
And I weep with fervent passion !

II. The Progress of Science

A wonderful instrument really
Has Chandidas' uncle made—
Everywhere they praise it freely
And 'bravo'-s are loudly said.

This uncle, when he was younger,
(Aged a year or so).
Cried out saying 'goongaa'
And made one hell of a row—

Most kids say 'pa-pa', 'ga-ga'
And spout no manner of sense ;
This deed, in the uncle's saga,
Amazed relations and friends.

They said, "This *wunderkind*
If he comes to riper age,
His name shall surely find
A place on History's page."

That child, grown old to-day,
By the power of his uffish thought,
Has found himself a novel way
To increase the pace of your trot.

You may cover a lengthy route
(Which took five hours before)
If our genius' thinking bears fruit—
In an hour and little more.

I went to see this invention ;
It was so very simple and fit,
With about five hours' meditation
You'd get the hang of it !

I wish I could be bolder
And explain it to you—
It's fixed onto your shoulder
And this is what you do :

You hang before your hungry nose
Your favourite foodstuff most—
Cakes or buns or if you chose,
Chocolate. or buttered toast—

You're bound to feel their attraction,
Your mouth moves up to eat...
The food, too, mimics your action
And moves as fast as your feet !

Thus moved fast by gluttony
With a treat before your face,
You'll never feel the monotony
But walk a brisker pace !

Full many a league you'il cover
With ease (and a little strain),
With the food beckoning ever,
Its smell driving you insane !

All men say (those who've heard),
Voices in unison,
"Chandidas' uncle, all over the world,
Will be hailed for his creation !"

III. A Conversation

"Hey ! Didn't you say that white was red ?
(And) didn't you snore last night in bed ?
(And) I hear your cats are all feline,
(And) none of you have beards like mine !
—What does all this mean, you fool ?
—I'll thrash you as you weren't at school!

"Just shut your mouth and eat your speech
Else I'll beat you till you screech !"

"Don't glare at me or shout such rot—
Speak to me gently, or if not.....
I wouldn't care for you a pat ;
I know karate, remember that !"

"Oh, so it's like that, is it ?
All right, com'n fight, com'n fight !"

"Pride rides before a fall, you'll see,
Were my uncle here you'd be
Thrashed to an inch of your measly life !"

"What, you'll hit me ? Disturb the peace ?
Just wait till I call the police....."

"Now, now, now, now ! Don't lose your head :
What was it you really said ?"

"That's true really, it's a joke merely.....
Why should we fight ? Have a fag.....Her'e a light."

"Shake hands.....it's all settled, mate,
Let's get home, it's getting late."

"No matter, all right, how-do-you-do, good night."

IV. The Rule of Law

In the land of Shiva
The laws are most peculiar—
If you slip and fall, I fear,
The warden takes you by the ear
Hauls you to a justiciar
—You lose 21 pennies clear.

Until the curfew's sound should cease
You require permission to sneeze :
For those who sneeze without a pass
The warden kicks them on the arse
And dusting snuff before their noses
—Makes each take 21 doses.

If anyone's tooth works loose,
Four bright coins he's sure to lose ;
If hair should shade your upper lips,
You'll each be taxed a hundred chips.
The warden prods your back betimes
—To make you bow 21 times.

If someone should, while on the way
Look right ; or left, or glance astray,
The case is brought before the king—
At once his wardens will take wing
And make him, sweating in the sun
—Drink all of cups full 21.

And such men do they put in cages
Who with rhymes fill up the pages,
And make them hear, to various tunes,
A hundred Chinks recite the runes ;
On grocer's accounts must they pore,
—Adding a page to a complete score.

If you snore without a warning,
In the small hours of the morning,
The furious Warden rubs your head
With dung and juice of poppies red ;
Then, paraded 21 times,
—You're hanged aloft for 21 chimes.

V. Midnight Sonata

Dreadful midnight, lonesome stark
The trees are draped in velvet-dark ;
Where the banyan's cobwebby tangle lies
There shine glowworms' glittering eyes ;
All round bushes in silence throng—
Come, brother Tomcat, join my song !
Come friend, let's sing loud and true
A song that shall be sweet to you :
Half-split in the eastern sky
Rose the Moon : a bloodshot eye ;
Above the tiles I remembered then
Lay half-a-sweet, from who knows when ;
I rushed there breathless, without any stops—
A shameless hussy sat licking her chops ;
The whole sweet in her cheeks was pressed
All hope at once fled my breast !
I wished, then, I could quit this life,
All, I saw, was illusion and strife
All was nasty, and empty to boot—
The mistress' face seemed black as soot !
My piercing grief bursts out anew
Come, friend, let's sing loud and true.

The Antinomies Of Richard Wagner

Rudrangshu Mukherjee

[This is the text of a talk delivered at Max Mueller Bhavan on 16 August, 1983 on the occassion of Wagner's death centenary. I have kept the lecture form and deliberately dispensed with footnotes and references.]

Born in 1813 Wagner was a contemporary of Karl Marx ; they died in the same year. Wagner's life, like Marx's, was associated with the age of revolution and the age of capital. This was clearly the age of the bourgeoisie, the first rosy flush of proletarian militancy in 1848 notwithstanding. The first half of the nineteenth century was dominated by the achievement of two revolutions ; one in Britain, the Industrial Revolution, and the other in France. Both heralded the triumph of a new society governed by the spirit of enterprise, reason and profit—the ideologies of the conquering bourgeoisie. Revolutions, however, by their own momentum, unleash forces that transcend the limits the leading actors would like to impose upon them. The bourgeoisie triumphed, but their victory was made possible by the help of the labouring poor and the professional classes. History seemed no longer to be made by kings and princes : people made their own history. Behind the structure of bourgeois political theories, lurked the masses and the radical intelligentsia with the potential to turn moderate liberal revolutions into far-reaching social ones. 1848 was their year of hope, but of that later.

The second half of the century saw the massive advance of the world economy of industrial capitalism. Capital seemed synonymous with progress. Iron and steel, railways, and the Suez canal seemed to be the epitomes of the age. The social order that capital represented, the ideas and beliefs which legitimised and ratified it in science, in reason and in liberalism were dominant. There was an air of certainty, of enlightened self-confidence. Yet the European bourgeoisie, latecomers to capitalism, was hesitant to commit itself to to public political rule. National unification could proceed but within the strict control of the bourgeoisie : democracy was not to be permitted to previsage socialism.

The counterpoint to the achievements and domination of the bourgeoisie were, as I have indicated, already present. Tocqueville voiced the fears of many Europeans when he said in in the Chamber of Deputies : "We are sleeping on a volcano.....Do you not see that the earth trembles anew ? A wind of revolution blows, the storm is on the horizon." Karl Marx and Fredrich Engels, from the other side of the fence, could speak of the spectre of communism that was haunting Europe. The prophets themselves did not know, perhaps, how close they were to the fulfilment of their own prophecy. Tocqueville uttered his words early in 1848. *The Communist Manifesto* was published on 24th Feb. 1848. On the same day the Republic was proclaimed in France ; the revolution overspread south-west Germany and Bavaria in the first week of March ; Berlin

and Vienna went to the revolutionaries on 11th and 13th March respectively, and Hungary and Italy soon after. The triumph of the bourgeoisie seemed at an end at least in the central core of Europe. The working class which the dominance of capital had engendered now seemed to be taking its dues and something over. The cunning of reason which had epitomised itself in the abstract slogans of liberty, fraternity and equality now transcended itself as the proletariat demanded their own content to such slogans. Liberty, whom Delacroix had placed on the barricades in 1830 with the national tricolour, now seemed to be on the barricades holding aloft the red flag, the symbol of international proletarian solidarity. It was, as Eric Hobsbawm has remarked, "the springtime of people."

On the barricades at Dresden Wagner fought. He was then thirty-six years old and the conductor of the Dresden opera. A few days earlier he had conducted Beethoven's Ninth Symphony at the opera house. But at the moment of the insurrection he watched with undisguised pleasure the house go up in flames. His pleasure was indeed, so great that many suspected him of starting the fire. A Communal Guard who was also a musician shouted to Wagner while watching the fire in an obvious allusion to the *Ode to Joy* : "Herr Kapellmeister, the divine ray of joy has come ablaze."

For the radical intelligentsia 1848 seemed to be the moment of arrival, of dreams coming true. It was the year of promise. For Wagner the excitement was internal. The sensation of being with the crowd intoxicated him ; the revolution had freed him from responsibility and also from the philistinism of the ***haute bourgeoisie*** who thronged the opera house. In fact, his enthusiasm for the insurrection had surprised his revolutionary friends like Bakunin and Rockel. They knew Wagner as apolitical, but impulsive to the extent of ringing alarm bells at the risk of his life. In reality, Wagner's support to the revolution, his vision for a better future was deeply contradictory. His was not the struggle for liberty and equality under a republic. Wagner wanted an ***absolute*** king, ruling over a free people, without parliment or nobility. There was a personal element in Wagner's enthusiasm for the revolution. He loved to merge his excitable self in movements involving people. in what he called "the mechanical stream of events." He had done it once in the 1830 uprising at Leipzig, he did it again at Dresden in 1848. He was also protesting against what he thought was the tyranny of the bourgeoisie, typified in the difficulties of his own life. For Wagner, the root of evil, was not monarchy but the philistive bourgeoisie. Therefore he despised parliaments and yet welcomed the Revolution, hoping that out of the chaos would arise a leader to lift the masses to power, to the heights of art and to a new German spirit.

The moment of hope, for Wagner and for revolutionaries of all shades of opinion, was short lived. The revolutions of 1848 failed rapidly and definitively all over Europe. Reaction took its revenge by becoming entrenched in Europe : never again in the nineteenth century was the continent to witness a revolution on the 1848 scale. Walt Whitman reflected the triumph of the forces of the ***status quo*** in the lines :

"The people scorned the ferocity of Kings
But the sweetness of mercy brew'd bitter
destruction and
the frightened monarchs come back,
Each comes in state with his train, hangman,
priest, taxgatherer, soldier, lord, jailer
and sycophant...

Meanwhile corpses lie in new-made graves,
bloody corpses of young men,
The rope of the gibbet hangs heavily, the
bullets of princes are flying, the creatures
of power laugh aloud".

For the radical intelligentsia the year of hope turned out to be the year of despair. Disillusionment took many forms : Marx found it immediately imperative to understand the nature of Bonapartism and its concomitant alignment of class forces, and later to anatomize the structure and dynamics of capital. Herzen turned to believing that man's fundamental questions were without solutions and that the later nineteenth-century revolutionaries were "the syphilis of our revolutionary passions." In Wagner the *votte face* was complete.

When the Prussian troops entered Dresden, Wagner fled in a hired coach, declaiming to Bakunin on the necessity of a regenerated German spirit and punctuating his speech with cries of "Fight, fight forever". But the fight disappeared from Wagner's own life and thought after the eighteenth Brumaite of Louis Napoleon. In his later life he reconciled himself to currying favour with the powers that be, first with Louis Napoleon and then with Ludwig II of Bavaria, under whose patronage was built the theatre at Bayrenth.

Wagner was pardoned by the German authorities. When the need to unify Germany arose out of the marriage between the Hohenzollern monarchy and the growing German capitalism (typified by Krupps), Wagner became the unofficial musical laureate of the new Bismarckian state. It was Wagner's self-appointed function to rouse the masses, through his own art, to the new German spirit. Bismarck, it must be admitted, with his characteristic Junker disdain, had no time for such popular notions.

In the aftermath of disillusionment Wagner came under the spell of Schopenhauer. There were two dominant traits in Schopenhauer's philosophy. The first was the apotheosis of the individual. Individualism was, of course, one of the hallmarks of bourgeois philosophy from the Renaissance to the economic theories of Adam Smith and Ricardo. This individualism was a philosophy of personal activity ultimately geared to promote the civic and social hegemony of the bourgeois class. In Schopenhauer, however, the individual is inflated into an absolute end in himself : detached from his social basis, the individual's activity now turns purely inwards, cultivating his private peculiarities and whims as absolute values. Secondly, there was Schopenhauer's pessimism. The evils of capitalism were not specific to the era of capital, but are general to man's being and existence. One had to aecept this condition without any moral condemnation. There was, then, a very strong element of ahistoricity in Schopenhauer. A natural corollary was renunciation : the Buddha was his ideal. But because the philosophy was fundamentally ambiguous, there was also the conception of a universal Eros which considered sex to be the focus of the will.

Wagner, whose nature struggled for enlightenment and release, for power as well as pleasure, seized upon Schopenhauer. He described Schopenhauer as "a gift from heaven to my loneliness". Elsewhere he writes, "How beautiful, that the old man knows nothing of what he is to me, and what I am to myself through him". One suspects that it was unaer the influence of the Schopenhauerian celebration of individual quirks that Wagner dabbled in everything under the sun—racism, hygiene,

vegetarianism. homosexuality, anti-alchoholism. vivisection, theosophy etc. The philosophy pandered to his intense egotism. The conception of the universal Eros led Wagner to the belief that "Love in its fullest reality is only possible within sex". But more importantly a mood of pessimism pervades his musical works : as Thomas Mann said it is "the mood of decline set to music." Nowhere is this better seen than in the changes made in the first and final versions of *The Ring*. In the first version Capitalism represented by the Giants opposes the oppressed workers (the Nibelungen). But in the final version politics is replaced by 'Love' in Brunhilde while Wotan represents the pessimism of Schopenhauer. The pessimism comes through again in *Tristan*. Take for example, the extolling of night ; day becomes full of falsehoods and phantoms, only night and its dreams are real ; Tristan and Isolde call themselves "night-consecrate". Wagner's version of the Tristan story was deeply immersed in Schopenhauer. Wagner saw in Tristan a figure to be interpreted in terms of disaffirmation. The deaths of Tristan and his royal mistress was for Wagner a Schopenhauerian triumph. Death, the logical end of pessimism, seemed the route to salvation.

The ahistoricism of Schopenhauer came through in Wagner's role as mythologist. Wagner, it has been said, discovered myths for the purposes of the opera ; he saved the opera through myth. He found himself in those works and in the musical language of the opera. It is the language of "once upon a time" in the further double-sense of "as it always was" and "as it always shall be" : a denial of time, a resurrection of the mythical tradition of heroes in an era of mass production. To deny the present corruption, the present lust for power, and the denial of love—all evils of the era of capital—Wagner sought refuge from reality in myth and legend. There was a revival of magic, ritual and tribal sagas. Simultaneous with such a revival came Wagner's Germanism : the uniqueness of German art and the need to regenerate it. The *Mastersingers* close with the couplet :

> Let fall to dust
> The Holy Roman Empire,
> And live for ever
> Our holy German art.

The panegyric of German art coincided and suited the needs of the growing German empire. Wagner rejoiced at the sight of the German army encamped in 1871 around Paris, his home during exile. What followed as a corollary to an essentially German awareness was the notion of racial purity. Wagner turned more and more anti-Semitic, and in his later years his hatred reached further to embrace those with black and yellow skins.

Through the universalization of programme music and the opera, Wagner sought to establish a new art form. In his book *Opera and Drama* he declared music to be the servant of drama. Wagner was essentially a man of the theatre, of the spectacle. The new form would supplant all musical forms. Wagner poured scorn on Mendelssohn, Schumann and Brahms. The new form would be composite, combining music, speech, painting and acting. It would be the only true art and the fulfilment of all artistic yearning, an art to end all art. The operas would be longer, the orchestras bigger, the singing louder and the stage spectacles more glamorous. The audience was to be left intoxicated and overwhelmed, plunged into another world. If Krupps commanded his armies of workers, Wagner dominated his audience. Will-nilly, there was something bourgeois in Wagner. His love for

the grandiose in his operas ...ng in common with the salons of ...od filled with silk, velvet, gold brocade ...d upholstered furniture. It was what Thomas Mann loved to call "bad nineteenth century." But it was bourgeois all the same, bourgeois as distinct from its original civic spirit. To the most materialistic of civilizations, Wagner seemed to supply the spiritual demands of the successful middle classes. Hence the cathedral at Bayrenth, with Wagner as its high priest.

Wagner leaves us with the overwhelming impression of a superimposition—"a double optic" as Nietzsche described it : a genius who could cater to the finest and the coarsest ; a supporter of the revolution in the most royalist of terms : a man desirous of riding the crest of history but a victim of history itself ; a composer who revolutionized music in his own time but was most appreciated by the class he considered philistine. The antinomies of Richard Wagner are perhaps the antinomies of the German bourgeoisie itself, a class incapable of commanding hegemony on its own and thus caught in the twilight zone of a transition not quite complete. Or maybe it was the antinomy of the nineteenth century where the achievements of that era seemed overwhelmed by the monsters of the twentieth. Wagner's heroes extolled in operas, in the cunning passages of history, had fathered unnatural vices. The corpse that he had planted began to sprout in the garden of Nazi Germany.

The Chasm

Bhaskar Sarkar

It was our first week at college. One afternoon, our classes being over for the day, we were sitting in the portico. A caterpillar was climbing up the wall. When I pointed it out to one of my classmates, who incidentaly happens to be a Bengalee, she remarked, "What do you mean by shoe-poker ? It's a caterpillar, yeah !" Someone had commented at that point—

"ট'্যাশগরু গরু নয়,
আসলেতে পাখি সে....."

The whole incident had elicited a hearty laugh from us. But since then two whole years have rolled by. My acquaintances are no longer confined to my department or year. Now, looking back in wistful reminiscence, with a wisdom acquired through experience not always happy, that incident on an indolent afternoon no longer seems a laughing matter.

In the first year, announcements at the fresher's welcome ceremony were being made in English, keeping in mind the convenience of the non-Bengalee students. A group of people, taking exception to this, voiced their displeasure quite vociferously—"বাংলা বল্, অত রঙ কীসের"—and the like, until the announcer's voice was drowned out. Thus the festive spirit was marred due to the crass lack of consideration on the part of a few. While the racket can partly be traced to a basic tendency to just 'boo' for the sake of booing, this does not constitute the complete explanation.

If one were to go deep into the reasons for this antagonism towards English, one would have to face some basic realities true of society as a whole. And these have distinct social, political and economic implication that are too diverse to be considered here. It would perhaps be more worthwhile to concentrate on the issues pertaining to our college, that are relevant in this context.

Of late it has been alleged that the college authorities prefer students coming from English medium schools. It is maintained that the stress laid on proficiency in English during admission to the college, (for example, a paper in English in the Economics and Statistics admission tests), coroborates this allegation. Let us leave it to the authorities to decide whether testing skill in English in the admission test is necessary or not. However, two things come to mind in this connexion. Good textbooks in most subjects are yet to be published in the vernacular, and most class lectures are also in English. So in order to read, listen or comprehend, one has to have a relatively good knowledge of English. Secondly, the college campus is only an extension of society, and therefore socially accepted norms cannot be overlooked. The fact remains that knowledge of English is not just a status symbol, but a decisive factor in the job market. It is no use denouncing the college authorities for their unwarranted stress on English, when proficiency in this alien language continues to be a criterion for judging a man's calibre.

It is claimed that as a result of discriminatory admission policy, the composition of the student body of the college has undergone a major transformation. The number of

'anglicised' students is increasing rapidly in some departments ; the departments of Economics, Political Science and History are noteworthy in this respect. Consequently, the atmosphere in the college is changing.

It has to be conceded that the simultaneous change has been discernable in the nature of the student body. In recent years, a number of excellent English medium schools in Calcutta have been doing very well at the Secondary and Higher Secondary levels. Moreover, people coming from such schools are often seen to overcome the craze for professional studies like engineering and medicine, and opt for more general disciplines. This can be ascribed to their greater awareness of job prospects in the corporate sector, and the fact that most of them come from relatively affluent homes. They can afford to face the uncertainties of these generalist's professions, while students from middle-class or poor families need the job assurance provided by specialised professional training. Thus brilliant students from relatively poor families branch off into the Engineering or medical colleges ; accordingly the proportions of financially well-off students is increasing in colleges like ours. Thus the conflict of languages assumes greater proportions. It becomes a conflict of different income-classes. This social stratification is reflected in the different groups in our college.

On the one hand, we have people, often coming from well-off homes, who usually converse in English. They have their interests, their modes of 'freaking-out', their sense of humour—all somewhat American in nature. They are aware of the famous Hollywood quips of the 1940's, but would not know much about Sukumar Ray and Parashuram. A new release of Deep Purple would be an event for them, while the first album of Geeta Ghatak goes unnoticed. And this even when most of them are Bengalees ! Some even proudly proclaim they have a limited knowledge of 'Bong'. It is not surprising therefore, that this section should steer clear of a poetry session in college featuring luminaries like Nirendranath Chakraborty and Sunil Gangopadhayay. Their absence does not stem just from apathy, which is an inherent feature in all our students. Their attitude towards anything 'Bong' is one of cold indifference bordering on condescension. Only what is 'hep' will attract them.

At the other end, there are the staunch 'Bengalee's whose penchant for preserving tradition verges on fanaticism. They would shun anything English ; to them rock-jazz, Simon and Garfunkel, jeans—all are anathema. This perhaps explains the poor turn-out from our college at the Autumn Invitation Debates organised at Gyan Manch, even though the motions were quite interesting. Yet many of them cannot help swaying to a 'disco' beat. Yes, 'disco', of all things from the West, has become very popular with a part of the avowed Bengalees.

The strong feeling of resentment towards the 'hep' crowd in the college can be traced partly to the aloofness of the English-speaking crowd. Perhaps more important is the strange wariness born out of several complexes. Somehow a sense of inferiority creeps into the minds of the Bengalee group. This is a product of our social conditioning.

So a disdainful attitude on the one hand, and an acrimonious sense of deficiency on the other, have led to a gaping chasm among the students of this college. Such discordant proximity results in tension and bitterness. When two such disharmonions groups pass each other, they maintain a piqued aloofness.

This bastion of rich cultural traditions is not being spared the onslaught of the decadent culture of the west. This is true of the student community as a whole. And our institution is no exception. But instead of singling out the degenerate elements, the staunch Bengalees have taken up the cudgels against western music in general, because it is 'sex-oriented' ; wearing jeans is immoral in their eyes. Likewise, Rodin is 'obscene' and Shakespeare bourgeois. 'অপসংস্কৃতি' has become a pet word. In fact the only form of pure art is the brand of sound and fury that goes by the name of 'গণসঙ্গীত'. To top it all, there has to be the indispensable political icing—that speaking in English betrays a clear rightish learning !

Having no real issues at hand, the different political and 'apolitical' groups wage battles on flimsy grounds. For them, this antagonism on the cultural front is a grand opportunity for wooing the students. They exploit the rift to enlist supporters, and in the process, widen the gulf. Attempts to foster healthy cooperation among all sections of the students have been nullified by their petty wranglings. What is astonishing is the fact that the students of Presidency College, who are supposed to possess 'above average' mental and intellectual capabilities, get bogged down in such narrow considerations. What should have been a source of shame continues to dominate their attitudes.

Nevertheless, there have been some attempts at reconciliation by a few students who are not polarised on such grounds. They know how to enjoy the best of both worlds. Thus they realise that if the gulf could be bridged, a lot could be achieved through creative communication. But such positive ventures are far too few in number. Disillusionment follows this initial zeal ; apathy sets in. They find the easy way out : indolent hours of singing and drumming on canteen tables ; listless gossip and small talk. Of late, some have even taken to playing ludo ! And the gap remains ever-widening.

The Survival of the Unfit : Neo-Darwinism through Literature

Srimati Basu

Fascination exists only at long distance, as Wordsworth discovered on viewing the Yarrow. We students of English literature have almost developed a similar outlook towards our academic pursuits.

For most of us, it had been a long-cherished dream to study English, only English, English without traumatic distractions like Differential Calculus or Isothermic charts. We were guilty, however, of committing the fundamental tactical error of underestimating the adversary. Our utopia of leisurely poetry-reading and whimsical essay-writing turned out to be a deceptive quagmire of stylistic conventions and Restoration theatre and scansion and verisimilitude. Now, one often feels like sighing nostalgically, "O, for a book of no-nonsense Chemistry or foolproof algebra !"

Yet dark disillusionment has a broad silver lining—the dreams we have lost are perhaps more than made up for by the worldly wisdom we have gained.

Literature's first lesson was that we live in a far more complex world than the one our innocent schoolgirl environment had revealed. Who had thought of Robinson Crusoe's economic policies or religious doctrines before ? Everything, we learnt, was not as straightforward as Mr. Rochester, miraculously cured of his blindness, marrying Jane Eyre. Here $(a+b)^2$ does not just add up to a^2+b^2+2ab — there are still stars in the sky and the magic of moonlight to take into account. As far as literature is concerned, complications are the spice of life. Ever since I came to know the profound implications of the once-innocuous 'Tiger, tiger, burning bright,' I have decided to develop a greyhound-nose for literary nuances—in fact, even 'Jack and Jill' now seems to have distinct Biblical references and shades of mysticism.

The world being indisputably divided into the privileged minority who study English and the mass who do not, we of the special breed must strive to be Supermen (Superwomen mostly, as far as Presidency College is concerned). This superiority must not only be apparent from the trifling academic requirement that we should be experts on history, religion and psychology into the bargain ; we must also develop qualities that would shame the diligence of a champion ant, the curiosity of the nosiest of Parkers, the dispassionate analysis of the most stony-hearted stoic. Every little love affair of Wordsworth, a sober and solemn poet if ever there was one, must be dragged out of obscurity for the present purpose of giving 'Lucy' a face, but who dares to to call the hallowed students of English Peeping Toms ? The subject of our lifelong study is the frenzied artist in an emotional fever, but while we are dissecting his passionate creation, we must remain cool and unmoved, entirely

unaffected by it ; such discipline of the heart is no mean feat. Our opinion of the artist has shot up : who can help admiring the creator who juggles with rhyme, metre, alliteration and onomatopoeia and still has something to say ? On the other hand, we take immense pride in donning our little brief garbs of authority too—as connoisseurs, we have the intoxicating privilege of finding fault with sacrosanct Shakespeare, or granting fulsome praise to Little Jack Horner. Every one of us is fated to seeing life steadily, and seeing it whole .....

Studying English Literature is still special. After all, literature is fascinating in its very concept : we deal not with minute, mean atoms nor the dead and gone past, but with

"The beauty and the wonder and the power
The shapes of things, their colours,
lights and shades,
Changes, Surprises."

The icing has worn off, but the cake is still tasty enough,

Editorial

The Dormant Phoenix

A writer on Calcutta once commented on the "quiet co-existence between the two parallel lines of tramtracks". Since its birth, the two 'tramtracks' of Presidency College have been its long-cherished traditions and its contribution to the future. Indeed, this paradoxical yet perfectly amicable combination of the two has been the real myth of the college : the legend that so many youthful generations have kept alive.

The basic tradition remains untarnished. As soon as the wide-eyed fresher enters the college premises, he becomes aware of its tradition-steeped genius : a relatively high standard of academic performance is maintained ; the political wrangling, however futile, continues unabated ; innovative thinking flourishes, and would-be-intellectuals remain undeterred by the obvious discrepancies in their thought. Even the lighter side of the Presidency world lingers on, according to age-old patterns : the drumming of canteen tables amid sips of tea, the book-shop browsing and voracious food-shop hunting, the occasional romantic tete-a-tete and frequent debates on everything under the sun. Tradition is undoubtedly a well-guarded possesion of this college.

But what has become sluggish, and what is now time-weary, is the mighty heart of the college. The fiery elder generations had many stars to reach, and the idealism to touch them with. Students today have very few dreams and thus very little to offer the future. A

pervasive aimlessness seems their consuming interest. Hope is moribund. Life pulsates but only in brief spasms, choked by an arid apathy.

This aura of dust and lethargy is frustrating what the students might have achieved in times to come. The myth has grown tattered at the edges. The phoenix is dormant. For the curious, a reason must be found : do the students, then, lack in calibre ? Or have the old ideals fallen out of step with time ? Are the horizons devoid of rainbows to reach out to ? Or have we grown so absorbed with ourselves as to be overly unconcerned with anything else ?

To the average student, the answers will seem redundant, almost irrelevant. The motionless face of the college-clock broods in bleak resignation. And one is filled with a foreboding that one day this heart too may stop forever.

Presidency today is our particular 'waste land', littered with a menageric of impassive 'bureaucrats', disillusioned 'politicians', pretentious 'intellectuals' and hapless souls. And we are "wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be born." Yet we still await a time when Presidency will cease to be merely an island of remembrance : a time when our place in the sun will be "where the past and future are gathered". Then this lean ghost of an illustrious past will become the foetus of the future. The legend must live on, and it is our task to rekindle the dying embers.

The college magazine is a kind of mirror for what Presidency College is at present, and is said to be "an organ of the corporate life of the college". Even while editing this section, the myth hovered in my consciousness. So I hope this issue retains the high standards and traditions, even while it presents a variegated image of 'today'.

Bishnupriya Ghosh

ফজলুল হক	ঃ	প্রাক্তন ছাত্র।
সত্যজিৎ রায়	ঃ	প্রাক্তন ছাত্র।
শঙ্খ ঘোষ	ঃ	প্রাক্তন ছাত্র।
শক্তি চট্টোপাধ্যায়	ঃ	প্রাক্তন ছাত্র।
রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়	ঃ	প্রাক্তন ছাত্র। অধুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। একদা এ পত্রিকার সম্পাদক।
সুদেষ্ণা চক্রবর্তী	ঃ	অধ্যাপিকা। প্রাক্তন ছাত্রী।
প্রবোধ বিশ্বাস	ঃ	কলা বিভাগের সহ-গ্রন্থাগারিক।
তপোব্রত ঘোষ	ঃ	প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

বি দা য়ী তৃ তী য় ব র্ষ

গার্গী দত্ত ইংরেজীর ছাত্রী। সম্প্রতি কলেজ-সংকলনে কবিদের সৃষ্টি করার আহ্বান জানিয়েছেন। আরো সম্প্রতি গান্ধারীর ভূমিকায় মেডেল পেয়েছেন। **সুতপা সেনগুপ্ত** বাংলার ছাত্রী। আপাদ-মস্তক কবি। **অভিজিৎ লাহিড়ী**-ও বাংলার ছাত্র, তবে দাড়ি আছে। আগের সংখ্যায় 'এপিটাফ' লিখেছিলেন। **সোমক রায়চৌধুরী** পদার্থবিদ্যার ছাত্র। তাঁর পাঠরুচির অন্তর্গত 'শব্দার্থ-খণ্ডিকা, লোকাণ্ট্রপ্রকরণ আয়স্কন্ধ-পদ্ধতি, পালস একস্ট্রা ইকুইলিব্রিয়ম অ্যাণ্ড দি নেগেটিভ জিরো...'। ইংরেজীর **নির্মাল্য ঘোষাল**-কে মেয়েরা মিষ্টি বলে। তার একটা কারণ তাঁর সদা-হাস্যসিক্ত আস্যও বটে। **শ্রীরূপ রায়চৌধুরী**-র হাতে শীতকালে গ্লাভস থাকে, অন্যসময়ে ছাতা। পদার্থবিদ্যার ছাত্র যদিও, কার্টুন-সিরিজের স্রষ্টা হিসেবে সবিশেষ খ্যাতি।

তৃ_তী য় ব র্ষ

সুদীপ্ত সেনগুপ্ত নিজেকে পদার্থবিদ্ বলে মনে করেন। দেহগতভাবে বামপন্থী, চিন্তাধারায় ততটা নন। কলেজে এটি তাঁর তৃতীয় বর্ষ। এ সংখ্যার অন্যতম সম্পাদক। **সুব্রত সেন** তৃতীয় বার্ষিক অ-পদার্থবিদ এবং মহানাগরিক কবি। অধর্মে আছেন জিরাফেও আছেন ঃ কিছুটা আমাদের প্রতি, কিছুটা ওদের প্রতি। **প্রগতি চট্টোপাধ্যায়** ইতিহাসের ছাত্রী। কলেজে গা-ঢাকা দিয়ে থাকেন। **দেবব্রত লাহিড়ী** অর্থনীতির ছাত্র, তাঁকেও বিশেষ দেখা যায় না। **অয়নেন্দ্রনাথ বসু**-র পাঠ্য বিষয় রাশিবিজ্ঞান। কলেজ নির্বাচনের দিন ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সাক্ষী রেখে গোলদীঘিতে সাঁতার কেটেছিলেন। **পারমিতা রায়চৌধুরী** উত্তরাধিকারসূত্রে পদার্থবিদ্যায়

পরিচয়

উৎসাহী। প্রেসিডেন্সিতে পড়েন বললে রসিকজনে শুধোয়—প্রেসিডেন্সি ইস্কুলও আছে নাকি? **শ্রবসী ঘোষ** রাশিবিজ্ঞানের ছাত্রী। বড় বড় চোখ, কিঞ্চিৎ উঁচু নাক। ভালো নাচেন। হুস্ হুস্ করে মাঝেমধ্যেই শান্তিনিকেতনে চলে যান। **সন্দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়** ইংরেজীর ছাত্র, মাথাভর্তি আইডিয়া। কোনওদিন একটা-কিছু নিশ্চয়ই ক'রে ফেলবেন। **ভানুসিংহ ঘোষ** কলকাতার বাবু কলচরের শেষ প্রতিনিধি। শারীরবিদ্যার ছাত্র এরকম জনশ্রুতি। **অম্বরনীল সেনগুপ্ত** মিহি স্টাইলে কথা বলেন। শব্দার্থে ভদ্রলোক, যদিও সাঙ্ঘাতিক নম্বর পান। বিষয় গণিতশাস্ত্র। **সন্দীপ্ত সেন** ইতিহাসের ছাত্র, খুব ভালো পিয়ানো বাজান। কলেজে তাঁর নাম 'মিকি', ভূশণ্ডীর মাঠে 'কারিয়া পিরেত' বা। **ভাস্কর সরকার** অর্থনীতির ছাত্র, সমস্যা খুঁজে বের করাই এনার প্রধান সমস্যা। প্রথম শ্রেণীর শ্রোতা। মাথার দীর্ঘতম চুলটি দেড় সেন্টিমিটার লম্বা।

দ্বি তী য় ব র্ষ

বিদিশা ঘোষ দস্তিদার প্রাণিবিদ্যার ছাত্রী। প্রিয় লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। **ভাস্বতী চক্রবর্তী** বাংলার ছাত্রী, নরমশরম মানুষ। কফি হাউসে তাঁর নিত্য যাওয়া-আসা। মৃদুভাষী **অভিজিৎ দত্ত**-র বিষয় অর্থনীতি। খাদি ভবনের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক। **শিবব্রত রায়** রাশিবিজ্ঞানের ছাত্র, সুবক্তা। ওজন ক'রে বিপ্লবের কথা বলেন, নিজের ওজন সাতানব্বুই কিলো। কাজের ফাঁকে অবশ্য ছাতির মাপটা নেওয়া হ'য়ে ওঠেনি। **বৃন্দা বসু** কলেজ নিয়ে প্রচুর ভাবনা-চিন্তা করেন। ও'র মতোই **মালিনী গুহ** ইংরেজীর ছাত্রী। গিন্নিবান্নি কথাবার্তা। **অরুষার্ক সেন** রাশিবিজ্ঞানের ছাত্র। আচার-ব্যবহারে সবসময়ে একটা দ্বিধার ভাব থাকে। দারুণ একমত হন। **শ্রীমতী বসু** অট্টহাসির জন্য পরিচিত-মহলে প্রসিদ্ধ। একদিন ভলিবল-কোর্টে উইকেট-কিপিং করতে দেখা গেছে। ইংরেজীর ছাত্রী। **সমীর রায়** সাড়া-জাগানো কার্টুন আঁকেন। সুযোগ-সন্ধানীদের চিহ্নিত করতে পেরে খুব খুশী। সুযোগ পেলে কর্পোরেশন স্কুলের মাস্টার হবেন। পদার্থবিদ্যার ছাত্র। **বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোষ** দ্বিতীয় বর্ষ ইংরেজীর ছাত্রী। মিষ্টি ব্যবহার। এ্যাতো সম্পাদকীয় ব্যস্ততার মধ্যেও একটা দিন চিড়িয়াখানায় কাটিয়ে এসেছেন।

প্র থ ম ব র্ষ

রঞ্জন লাহিড়ী-র বিষয় পদার্থবিদ্যা। একদা কস্মিন্ কবিসম্মেলনে বলেছিলেন, 'কবি হ'তে গেলে শুধু হেড থাকলে হয় না, ফোরহেডও থাকা চাই'।

Past Editors and Secretaries

Year	*Editors*	*Secretaries*
1914-15	Pramatha Nath Banerjee	Jogesh Chandra Chakravarti
1915-17	Mohit Kumar Sen Gupta	Prafulla Kumar Sircar
1917-18	Saroj Kumar Das	Ramaprasad Mukhopadhyay
1918-19	Amiya Kumar Sen	Mahmood Hasan
1919-20	Mahmood Hasan	Paran Chandra Gangooli
1920-21	Phiroze E. Dastoor	Shyama Prasad Mookerjee
1921-22	Shyama Prasad Mookerjee Brajakanta Guha	Bimal Kumar Bhattacharya Uma Prasad Mookerjee
1922-23	Uma Prasad Mookerjee	Akshay Kumar Sirkar
1923-24	Subodh Chandra Sen Gupta	Bimala Prasad Mukherjee
1924-25	Subodh Chandra Sen Gupta	Bijoy Lal Lahiri
1925-26	Asit K. Mukherjee	
1926-27	Humayun Kabir	Lokes Chandra Guha Roy
1927-28	Hirendranath Mukherjee	Sunit Kumar Indra
1928-29	Sunit Kumar Indra	Syed Mahbub Murshed
1929-30	Taraknath Sen	Ajit Nath Roy
1930-31	Bhabatosh Dutta	Ajit Nath Roy
1931-32	Ajit Nath Roy	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1933-34	Nikhilnath Chakravarty	Girindra Nath Chakravarti
1934-35	Ardhendu Bakshi	Sudhir Kumar Ghosh
1935-36	Kalidas Lahiri	Prabhat Kumar Sircar
1936-37	Asok Mitra	Arun Kumar Chandra
1937-38	Bimal Chandra Sinha	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Pratap Chandra Sen Nirmal Chandra Sen Gupta	Abu Sayeed Chowdhury

Year	Editor	Secretaries
1939-40	A. Q. M. Mahiuddin	Bimal Chandra Datta
1940-41	Manilal Banerjee	Prabhat Prasun Modak
1941-42	Arun Banerjee	Golam Karim
1942-46		No Publication
1947-48	Sudhindranath Gupta	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Subir Kumar Sen	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Dilip Kumar Kar	Sourindramohan Chakravarti
1950-51	Kamal Kumar Ghatak	Manas Mukutmani
1951-52	Sipra Sarkar	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Arun Kumar Das Gupta	Jyotirmoy Pal Chaudhuri
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta	Pradip Das
1954-55	Sukhamoy Chakravarty	Pradip Ranjan Sarbadhikari
1955-56	Amiya Kumar Sen	Devendra Nath Banerjee
1956-57	Asoke Kumar Chatterjee	Subal Das Gupta
1957-58	Asoke Sanjay Guha	Debaki Nandan Mondal
1958-59	Ketaki Kushari	Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Gayatri Chakravarty	Rupendra Majumdar
1960-61	Tapan Kumar Chakravarty	Ashim Chatterjee
1961-62	Gautam Chakravarty	Ajoy Kumar Banerjee
1962-63	Badal Mukherji Mihir Bhattacharya	Alok Kumar Mukherjee
1963-64	Pranab Kumar Chatterjee	Pritis Nandy
1964-65	Subhas Basu	Biswanath Maity
1965-66		No Publication
1966-67	Sanjay Kshetry	Gautam Bhadra
1967-68		No Publication
1968-69	Abhijit Sen	Rebanta Ghosh
1969-72		No Publication
1972-73	Anup Kumar Sinha	Rudrangshu Mukherjee
1973-74	Rudrangshu Mukherjee	Swapan Chakravarty
1974-75	Swapan Chakravarty	Suranjan Das
1975-76	Shankar Nath Sen	
1976-77		No Publication
1977-78	Sugata Bose Gautam Basu	Paramita Banerjee
1978-81		No Publication
1981-82	Debasis Banerjee Somak Ray Chaudhury	Banya Datta
1983-84	Sudipta Sengupta Bishnupriya Ghosh	Subrata Sen